POSTAL REG NO GDP- 43 / 2023--2025

আল্লাহ্‌র বাণী

وَمَا تَنۡقِمُ مِنَّاۤ اِلَّاۤ اَنۡ اٰمَنَّا بِاٰیٰتِ
رَبِّنَا لَمَّا جَآءَتۡنَا ؕ رَبَّنَاۤ اَفۡرِغۡ
عَلَیۡنَا صَبۡرًا وَّ تَوَفَّنَا مُسۡلِمِیۡنَ○

এবং তুমি আমাদের উপর শুধু এই জন্য প্রতিশোধ লইতেছ যে, আমরা আমাদের প্রভুর আয়াতসমূহের উপর ঈমান আনিয়াছি, যখন ঐগুলি আমাদের নিকট আসিল। হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদিগকে ধৈর্য দান কর এবং আমাদিগকে আত্ম-সমর্পণকারী অবস্থায় মৃত্যু দাও।'

(আল আরাফ: ১২৭)

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلى على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود
وَلَقَدۡ نَصَرَکُمُ اللّٰہُ بِبَدۡرٍ وَّاَنۡتُمۡ اَذِلَّۃٌ

খণ্ড 10

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

Weekly BADAR Qadian Bangla

www.akhbarbadarqadian.in

সংখ্যা 33

সম্পাদক: তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক: মির্যা সফিউল আলাম

বৃহস্পতিবার 14 Aug, 2025 19 সফর-1447 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যেদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

রসুলুল্লাহ (সা.)-এর বাণী

হাদীস শরীফ

* হযরত মাআজ (রা.) বর্ণনা করেন যে, হযরত রসুল করীম (সা.) আমাকে রাষ্ট্রনায়ক করে প্রেরণ করেন এবং বলেন: তোমাকে অনেক সময় আহলে কিতাব (খৃষ্টান ও ইহুদী) গণের সম্মুখীন হতে হবে। তুমি তাদেরকে তখন এই কথার প্রতি আহ্বান জানাবে যে, তাহারা যেনন সাক্ষী দেয়, আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নাই এবং আমি (মোহাম্মদ সা:) আল্লাহর রসুল। যদি তারা তোমার এই কথা মেনে নেয়, তবে তাদেরকে বলবে যে, আল্লাহ্ তা'লা তাদের উপর পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করা ফরজ করেছেন। যদি তারা তোমার এই কথা কবুল করে, তা হলে তাদেরকে বলবে যে, আল্লাহ্ তা'লা তাদের উপর সদকা অর্থাৎ আর্থিক কুবানী দেওয়া ফরজ করেছেন, যা তাদের বিত্তবানদের থেকে নেওয়া হবে এবং তাদের দরিদ্রগণকে দান করা হবে। যদি তারা একথাও মেনে নেয় তবে সেক্ষেত্রে তাদের থেকে তাদের উৎকৃষ্ট সম্পদ নেওয়া থেকে বিরত থাকবে। মজলুমের দোয়া থেকে নিজেদের রক্ষা করো, কেননা মজলুমের দোয়া এবং আল্লাহ্‌তা'লার মধ্যে কোন ব্যবধান বা প্রতিবন্ধকতা নেই। অর্থাৎ তা সরাসরি আল্লাহর দরবারে পৌঁছায় এবং কবুল হয়ে যায়।

[হাদীকাতুস সালেহীন থেকে উদ্ধৃত]

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) বলেছেন যে, আঁ হযরত (সা.) বলেছেন: 'পথে বসা থেকে বিরত থাকবে।' লোকে বলল: রসুলুল্লাহ্! আমরা এই সব স্থানে বসতে বাধ্য। সেখানে বসে আমরা কথা-বার্তা বলি; পরস্পর পরামর্শাদি করে থাকি।' একথা শুনে হুযুর (সা.) বললেন:' যদি তোমাদের বসতেই হয়, তবে পথের অধিকার পথকে দিবে।' সাহাবাগণ (রা.) নিবেদন করলেন: 'পথের অধিকার কি'? হুযুর (সা.) বললেন: 'দৃষ্টি অবনত রাখা এবং কাউকেও দুঃখ-কষ্ট না দেওয়া, সালামের উত্তর দেওয়া, সৎ কর্মের উপদেশ দেওয়া এবং অসৎ কথা ও কর্ম থেকে বিরত রাখা।'

(মুসলিম, কিতাবুস সালাম)

মানুষ যতই খোদা তা'লার নৈকট্য অর্জন করবে, ততই দোয়ার গ্রহণীয়তার ফল থেকে অংশ লাভ করবে।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর পবিত্র বাণী

একথা ভালভাবে স্মরণ রেখো যে, মানুষের দোয়া সেই সময় গৃহীত হয় যখন সে আল্লাহ্ তা'লার জন্য উদাসীনতা ও দুর্নীতি পরিহার করে। মানুষ যতই খোদা তা'লার নৈকট্য অর্জন করবে, ততই দোয়ার গ্রহণীয়তার ফল থেকে অংশ লাভ করবে। এই কারণেই আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন-

وَاِذَا سَاَلَکَ عِبَادِیۡ عَنِّیۡ فَاِنِّیۡ قَرِیۡبٌ ؕ اُجِیۡبُ دَعۡوَۃَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ ۙ فَلۡیَسۡتَجِیۡبُوۡا لِیۡ وَلۡیُؤۡمِنُوۡا بِیۡ لَعَلَّہُمۡ یَرۡشُدُوۡنَ

(আল বাকারা: ১৮৭) এবং অন্যত্র বলেন- وَاَنّٰی لَہُمُ التَّنَاوُشُ مِنۡ مَّکَانٍۭ بَعِیۡدٍ (সাবা: ৫৩) অর্থাৎ যে ব্যক্তি আমার থেকে দূরে আছে তার দোয়া আমি কিভাবে শুনব? পক্ষান্তরে এর দ্বারা প্রকৃতির সাধারণ নিয়মের পটভূমি থেকে একটি শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। খোদা যে আদৌ শুনতে পান না-এমনটি কিন্তু না। তিনি তো অন্তর্যামী, যিনি হৃদয়ের সেই সব বিষয় সম্পর্কেও অবগত যা এখনও ভবিষ্যতের গর্ভে রয়েছে। কিন্তু এখানে মানুষকে খোদা তা'লার নৈকট্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করার মাধ্যমে বলা হয়েছে যে, যেভাবে দূরের শব্দ শোনা যায় না, অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি উদাসীনতা ও দুর্নীতিতে নিমজ্জিত থেকে আমার থেকে দূরে থাকে, সে যত দূরে থাকে, ততই তার দোয়ার গ্রহণীয়তার মধ্যে অন্তরায় ও দূরত্ব সৃষ্টি হয়।

নির্বোধ মানুষ অনেক সময় দোয়া গৃহীত না হওয়ার কারণে মুরতাদ হয়ে যায়। সহীহ বুখারীতে হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে, নফল (ইবাদত)-এর মাধ্যমে মোমেন আমার নৈকট্যভাজন হয়ে ওঠে। (ইবাদত দুই প্রকারের) এক-ফরজ এবং দ্বিতীয়টি হল নফল। অর্থাৎ একদিকে রয়েছে সেই সব আদেশাবলী যা আবশ্যক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত এবং নফল হল সেই সব অতিরিক্ত ইবাদত যা ফরজ পালনের পর করা হয়ে থাকে। আর এর কারণ হল, ফরজ ইবাদতসমূহে যদি কোন অসম্পূর্ণতা থেকে যায় তবে তা নফল থেকে যেন পূর্ণ করা যায়।

লোকে নফল বলতে কেবল নফল নামাযই বোঝে। তবে একথা সঠিক নয়। প্রতিটি কর্মের সঙ্গে নফল যুক্ত।

মানুষ যাকাত দেয়, কিন্তু মাঝে মধ্যে যাকাতের অতিরিক্তও দেওয়া উচিত। রমযানের রোযা রাখলেও (বছরের অন্যান্য সময়ও) অতিরিক্ত রোযা রাখা উচিত। ঋণ নিলে (পরিশোধের সময়) কিছু অতিরিক্ত দেওয়া উচিত, কেননা সে অনুগ্রহ করেছে।

নফল হল ফরজের পরিপূরক। নফলের সময় অন্তরে এক প্রকার ভীতি ও শঙ্কা থাকে যে, ফরজের ক্ষেত্রে যে ত্রুটি ও অপূর্ণতা থেকে গেছে তা যেন এখন পূর্ণ হয়। এটিই সেই গোপন রহস্য যার কারণে খোদা তা'লার নৈকট্যের সঙ্গে নফলের অনেক বড় সম্পর্ক রয়েছে। অনুনয়-বিনয় ও বিচ্ছিন্নতার অবস্থা তার মধ্যে সৃষ্টি হয় আর এই কারণেই নৈকট্যের কারণে 'বীয-দিবস' (ইসলামিক মাসগুলির ১৩, ১৪ ও ১৫তম দিন) -এর রোযা, শওয়াল-এর ছয়টি রোযা-এগুলি সব নফল (ইবাদত)। (মালফুযাত, ২য় খণ্ড, পৃ: ৭৯-৮০)

ইসলাম সততা, বিশ্বস্ততা এবং অঙ্গীকার রক্ষাকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে থাকে। ইসলাম মতে, সেই মোমেনই সফলকাম হতে পারে, যে- বিশ্বস্ততা এবং অঙ্গীকার রক্ষার সর্বোৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারে।

সৈয়্যেদানা হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) সূরা আল মোমেনুন-এর ৯ নং আয়াত এর ব্যাখ্যায় বলেন-

অঙ্গীকার রক্ষার বিষয়ে রসুল করীম (সা.) অতিমাত্রায় সজাগ থাকতেন। তাঁর নবুয়তের দাবির পূর্বে বিভিন্ন গোষ্ঠী দ্বন্দ্ব এবং নিত্যদিনের পারস্পরিক বিবাদ দেখে মক্কার কতিপয় যুবক একটি সংগঠন তৈরী করেছিল, যার উদ্দেশ্য ছিল অত্যাচারিতদের সহায়তা করা। রসুল করীম (সা.)ও সেই সংগঠনে যোগদান করেছিলেন এবং সকলে মিলে শপথ নিয়েছিলেন যে, যতদিন সমুদ্রে পানির একটি বিন্দু পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকবে, তারা সব সময় অত্যাচারিতদের সাহায্য করবেন এবং অত্যাচারিতদের থেকে তাদের অধিকার পাইয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবেন। আর এমনটা করতে না পারলে তারা নিজেদের পক্ষ থেকে অত্যাচারিতদের অধিকার দান করবেন। অত্যাচারিতদের দুঃখ লাঘব ও তাদের আমানত রক্ষা করার জন্য দায়িত্ব নিয়ে যে সংগঠনটির ভিত রচিত হয়েছিল তা কিভাবে কাজ করেছে এবং অত্যাচারিতদের সাহায্য করেছে? এ সম্পর্কে ঐতিহাসিকভাবে খুব বেশি তথ্য পাওয়া যায় না। কিন্তু নবুয়্যতের দাবির পর যখন মক্কার মানুষ মহম্মদ রসুলুল্লাহ্

এরপর ১১ পাতায়....

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

জুমআর খুতবা

আল্লাহ্ তা'লার নিদর্শনাবলি দেখে মুসলমানদের হৃদয় ঈমানে এতটাই পরিপূর্ণ হচ্ছিল এবং মহানবী (সা.)-এর প্রভাব-প্র তিপত্তির প্রতি তাদের বিশ্বাস এভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছিল যে, মহানবী (সা.) যখন যমযমের সেই ঝরনা থেকে- যা হযরত ইসমাঈল বিন ইবরাহীম (আ.)-এর পান করার জন্য আল্লাহ্ তা'লা নিদর্শনস্বরূপ নির্গত করেছিলেন- পানি পান করার জন্য আনিয়ে নেন এবং সেখান থেকে কিছু পানি পান করে অবশিষ্ট পানি দিয়ে তিনি (সা.) ওযু করেন, তখন তাঁর শরীর থেকে এক ফোঁটা পানিও মাটিতে পড়তে পারে নি। কেননা মুসলমানরা তৎক্ষণাৎ তা হাত পেতে নিয়ে নিচ্ছিল এবং বরকত হিসাবে নিজের শরীরে মাখছিল। আর (এই দৃশ্য দেখে) মুশরিকরা বলছিল, আমরা পৃথিবীতে এমন কোনো বাদশা দেখি নি যার সাথে তার জাতির লোকদের এতটা হৃদ্যতা রয়েছে!"

মক্কা বিজয়ের দিনে মহানবী (সা.) বলেন, اَللّٰهُمَّ اِنَّ الْعَيْشَ عَيْشُ الْاٰخِرَةِ অর্থাৎ, হে আল্লাহ্! নিশ্চয় প্রকৃত জীবন হলো পরকালের জীবন।

মক্কা বিজয়ের দিন মহানবী (সা.)-এর হাতে ধনুক ছিল। তিনি (সা.) ধনুকের এক প্রান্ত ধরেন। তিনি (সা.) যখনই কোনো প্রতিমার পাশ দিয়ে যেতেন তখন এটি (ধনুক) দিয়ে প্রতিমার চোখে আঘাত করতেন এবং বলতেন, جَآءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا (সূরা বনী ইসরাঈল: ৮২) অর্থাৎ "সত্য এসে গেছে এবং মিথ্যা পালিয়ে গেছে; নিশ্চয়ই মিথ্যা পলায়ন করারই ছিল।"

এক বর্ণনায় এসেছে, মহানবী (সা.) বলেছিলেন-

أَقُوْلُ كَمَا قَالَ يُوْسُفُ: لَا تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ, আমি সেই কথাই বলব যা হযরত ইউসুফ (আ.) বলেছিলেন, 'আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই। আল্লাহ্ তোমাদের ক্ষমা করুন, আর তিনিই তো সর্বাধিক দয়ালু।' লোকেরা সাধারণ ক্ষমার এই ঘোষণার কথা শুনে এমনভাবে বেরিয়ে এলো যেন তারা কবর থেকে জীবিত হয়ে উঠেছে এবং তারা দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করতে শুরু করল।

মক্কা বিজয়ের প্রেক্ষাপট ও মহানবী (সা.)-এর অনুপম আদর্শ

সৈয়্যদনা আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের টিলফোর্ড স্থিত মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত ৪ জুলাই, ২০২৫, এর জুমআর খুতবা (৪ ওয়াফা, ১৪০৪ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ- بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ-

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ- الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ- مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ- اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ-

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ- صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ-

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, মক্কা বিজয়ের প্রেক্ষাপটে মক্কায় প্রবেশকালের বৃ ত্তান্ত গত খুতবায় উপস্থাপন করা হয়েছিল। এর বিস্তারিত বিবরণ এভাবে বর্ণিত হয়েছে: ইবনে ইসহাক লিখেছেন, আবু সুফিয়ান যখন তার পাশ দিয়ে অতিক্রম করা আল্লাহ্ তা'লার বাহিনীকে দেখে (মক্কায়) পৌঁছাল, ততক্ষণে মুসলমানরা যী-তোয়াতে পৌঁছে গিয়েছিল, যা মসজিদুল হারাম থেকে আধা মাইল দূরে অবস্থিত মক্কার একটি উপত্যকা। সাহাবীরা সেখানে পৌঁছে মহানবী (সা.)-এর অপেক্ষায় ছিলেন। একপর্যায়ে সমস্ত সাহাবী সেখানেই সমবেত হন। তিনি (সা.) তাঁর সবুজ পোশাক পরিহিত দলটির সাথে আসেন। ইবনে সা'দ লেখেন, তিনি (সা.) তাঁর উটনী 'কাসওয়া'র পিঠে হযরত আবু বকর এবং উসায়েদ বিন হুযায়েরের মাঝখানে বসা ছিলেন। হযরত আবদু ল্লাহ্ বিন মুগাফফাল বর্ণনা করেন, আমি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে দেখেছি, মক্কা বিজয়ের দিন তিনি তাঁর উটনীর ওপর ছিলেন এবং সূরা ফাতহ পাঠ করছিলেন। এই

রেওয়ায়েতটি বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে। হযরত আনাস (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, তিনি (সা.) যখন মক্কা মুকাররামায় প্রবেশ করেন তখন মানুষ তাঁকে দেখার জন্য আসে। বিনয়ের কারণে তাঁর (সা.) মাথা হাওদা স্পর্শ করছিল; অর্থাৎ উটের পিঠে যে গদি ছিল, যেখানে তিনি বসা ছিলেন, তার সামনের অংশকে স্পর্শ করছিল। মক্কা মুকাররামায় প্রবেশের সময় তিনি কালো রঙের পাগড়ি পরিহিত ছিলেন। তাঁর ঝান্ডাও কালো ছিল এবং পতাকাও কালো ছিল। কতক রেওয়ায়েত অনুযায়ী ছোটো ঝান্ডা অর্থাৎ পতাকাটি সাদা রঙের ছিল। তিনি (সা.) যী-তোয়া নামক স্থানে লোকজনের মাঝে তিনি দণ্ডায়মান হন। বিজয় এবং মুসলমানদের বিপুল জনরাশি দেখে বিনয়ের কারণে তাঁর পবিত্র শ্মশ্রু হাওদা স্পর্শ করছিল অথবা স্পর্শ করার উপক্রম হয়েছিল। তিনি (সা.) বলেন, اَللّٰهُمَّ اِنَّ الْعَيْشَ عَيْشُ الْاٰخِرَةِ অর্থাৎ, হে আল্লাহ্! নিশ্চয় প্রকৃত জীবন হলো পরকালের জীবন।

ন্যায়বিচার ও ইনসাফ এবং বিনয় ও নম্রতার আরেকটি দিক এটি ছিল যে, তিনি (সা.) তাঁর পেছনে নিজের মুক্ত করা ক্রীতদাস যায়েদ বিন হারেসার পুত্র উসামাকে আরোহণ করিয়ে রেখেছিলেন, অথচ সেখানে কুরাইশ নেতৃবৃন্দ এবং বনু হাশেমের সন্তানরাও উপস্থিত ছিল। তিনি (সা.) ২০ রমযানুল মোবারক তারিখে মক্কায় প্রবেশ করেন আর তখন বেলা হয়ে গিয়েছিল।

(সুবুলুল হুদা, ৫ম খণ্ড, পৃ: ২২৬) (সহীহ বুখারী, কিতাবুল মাগাযি হাদীস-৪২৮১) (ফারহাঙ্গে সীরাত, পৃ: ১৮০) (আত্তাবাকাতুল কুবরা, ২য় খণ্ড, পৃ: ১০৩-১০৪) (আমতাউল আসমা, ৮ম খণ্ড, পৃ: ৩৮৪) (তারিখুল খামিস, ২য় খণ্ড, পৃ: ৮৪) (আসসীরাতুল হালবিয়া, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১২২) (সুনান তিরমিযি, আবওয়াবুল জিহাদ, হাদীস-১৬৭৯) (যুরকানি, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৪১৪)

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বর্ণনা করেন: সেই মাহাত্ম্য যা খোদা তা'লার বিশেষ বান্দাদের প্রদান করা হয়, তা বিনয়ের পোষাকে প্রকাশ পায়, আর শয়তানের উচ্চতায় অহংকার মিশ্রিত থাকে। দেখো! আমাদের নবী করীম (সা.) যখন মক্কা বিজয় করেন তখন তিনি সেভাবেই নিজের মাথা ঝুঁকিয়েছেন আর সিজদা করেছেন, যেভাবে তিনি সেসব বিপদ ও কষ্টের দিনগুলোতে মাথা ঝোঁকাতেন ও সিজদা করতেন, যখন এই মক্কাতেই সকলভাবে তাঁর বিরোধিতা করা হতো এবং তাঁকে কষ্ট দেওয়া হতো। তাঁর হৃদয় আল্লাহ্র কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ হয়ে যায় এবং তিনি সিজদাবনত হন, যখন তিনি (সা.) তাঁর এখান থেকে (মক্কা থেকে) বের হওয়ার ও ফিরে আসার বিষয়টি তুলনা করেন।"

(মালফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৬০-এর টিকা)

মক্কা বিজয়ের দিনে তিনি (সা.) কোথায় অবস্থান করেছিলেন- এ সম্পর্কে লেখা আছে: মক্কার কাছাকাছি পৌঁছে যখন তাঁর (সা.) কাছে নিবেদন করা হয়, মক্কায় কোথায় অবস্থান করবেন? তখন তিনি (সা.) বলেন, মক্কায়

আকীল আমাদের জন্য কোনো ঘর বাকি রেখেছে নাকি? আকীল ছিলেন হযরত আবু তালেবের পুত্র এবং তিনি হুদাইয়বিয়ার সন্ধির কিছুকাল পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। আর বলা হয়, এর পূর্বেই তিনি সমস্ত সম্পত্তি বিক্রি করে দিয়েছিলেন। এরপর তিনি (সা.) বলেন, আমাদের অবস্থান খাইফ বনী কিনানা-তে হবে যেখানে কুরাইশরা কুফরের বিষয়ে শপথ করেছিল, আর সকল সাহাবীকে সেখানেই সমবেত হবার নির্দেশ দেওয়া হয়। হযরত জাবের (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে যে, সেদিন আমিও তাদের মাঝে ছিলাম যারা তাঁর (সা.) সাথে ছিল। মক্কা বিজয়ের দিন আমি মহানবী (সা.)-এর সাথেই প্রবেশ করি এবং তিনি (সা.) মক্কার ঘরগুলি দেখে থেমে যান। তিনি (সা.) তখন আল্লাহ্ তা'লার প্রশংসা ও মহিমা কীর্তন করেন। তিনি (সা.) তাঁর তাঁবুর স্থানের দিকে তাকিয়ে বলেন, হে জাবের! এটি আমাদের অবস্থান স্থল। এখানেই কুরাইশরা আমাদের বিরুদ্ধে কুফরের অবস্থায় শপথ করেছিল। হযরত জাবের (রা.) বলেন, এতে আমার সেই কথা স্মরণ হয় যা আমি মদীনায় তাঁর (সা.) কাছে শুনেছিলাম। অর্থাৎ তিনি (সা.) বলেছিলেন, যখন আমরা মক্কা বিজয় করব, তখন আমাদের অবস্থান খাইফ বনু কিনানায় হবে যেখানে কুফরের অবস্থায় তারা শপথ করেছিল যে, তারা বনু হাশেমের সাথে কেনা-বেচা করবে না আর তাদের সাথে বিয়েশাদিও করবে না এবং তাদেরকে আশ্রয়ও দেবে না, আর তাদেরকে শে'বে আবী তালেব নামক একটি উপত্যকায় অবরুদ্ধ থাকতে বাধ্য করে।

আলেমদের মতে, মহানবী (সা.) সম্ভবত আল্লাহ্ তা'লার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশস্বরূপ এখানে থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন; এটি হলো কারো কারো মত। কিছু রেওয়ায়েত অনুসারে তাঁর (সা.) কাছে মক্কায় নিজের বাড়ির পরিবর্তে অন্য কারো বাড়িতে অবস্থান করার প্রস্তাব দেওয়া হয়। তিনি (সা.) অস্বীকৃতি জানিয়ে বলেন, আমি অন্য কারো বাড়িতে প্রবেশ করব না। হযরত আবু রাফে (রা.) হাজুন নামক স্থানে তাঁর (সা.) তাঁবু স্থাপন করেছিলেন। মহানবী (সা.)-এর সাথে তাঁর সহধর্মিণীদের মধ্য থেকে হযরত উম্মে সালামা এবং মাইমুনা (রা.) ছিলেন। তিনি (সা.) প্রতি ওয়াক্ত নামাযের জন্য হাজুন থেকে মসজিদুল হারামে আগমন করতেন।

(উসদুল গাবা, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৬১) [দায়েরায়ে মারেফ, ৯ম খণ্ড, পৃ: ৯৯-১০০) (সুবুলুল হুদা ৫ম খণ্ড, পৃ: ২৩০-২৩১) (ফতহুল বারি, ৮ম খণ্ড, পৃ: ১৭-১৮) (আল লউলুল মাকনুন, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৪৯)

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বিভিন্ন ইতিহাসের গ্রন্থ থেকে নিয়ে বর্ণনা করেন, আল্লাহ্র রসূল (সা.) যখন মক্কায় প্রবেশ করেন তখন লোকেরা তাঁকে (সা.) জিজ্ঞেস করে, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আপনি কি নিজ বাড়িতে অবস্থান করবেন? মহানবী (সা.) বলেন, আকীল কি আমাদের জন্য কোনো ঘর বাকি রেখেছে? অর্থাৎ আমার হিজরতের পর আমার আত্মীয়স্বজনরা আমার সমস্ত সহায়-সম্পত্তি বিক্রি করে খেয়ে ফেলেছে। এখন মক্কায় আমার জন্য কোনো ঠিকানা নেই। আকীল মহানবী (সা.)-এর চাচাতো ভাই। এরপর তিনি (সা.) বলেন, আমরা খাইফ বনী কিনানায় অবস্থান করব। এটি ছিল মক্কার একটি উন্মুক্ত ময়দান যেখানে কুরাইশ ও বনু কিনানা গোত্র একত্রে মিলে শপথ করেছিল যে, যতক্ষণ বনু হাশেম এবং বনু আব্দিল মুত্তালিব মুহাম্মদ (সা.)-কে বন্দি করে আমাদের হাতে তুলে না দেবে এবং তাঁর (সা.) সঙ্গ দেওয়া পরিত্যাগ না করবে, ততক্ষণ আমরা তাদের সাথে বিয়েশাদিও করব না, ক্রয়-বিক্রয়ও করব না। এই অঙ্গীকারের পর আল্লাহ্র রসূল (সা.) ও তাঁর চাচা আবু তালেব এবং তাঁর (সা.) জামা'তের সকল সদস্য আবু তালেব-এর উপত্যকায় আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং তিন বছরের কঠোর কষ্ট সহ্য করার পর খোদা তা'লা তাদের মুক্তি দান করেছিলেন। মহানবী(সা)-এর এই নির্বাচন কতই না সূক্ষ্ম, সুন্দর ছিল। মক্কাবাসীরা এই স্থানেই শপথ করেছিল, যতদিন পর্যন্ত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে আমাদের হাতে তুলে না দেওয়া হবে ততদিন আমরা তার (সা.) গোত্রের সাথে সন্ধি করব না। আজ আল্লাহ্র রসূল মুহাম্মদ (সা.) সেই ময়দানেই গিয়ে অবস্থান নেন আর (এভাবে) যেন মক্কাবাসীদের বলেন, তোমরা যেখানে চেয়েছিলে আমি সেখানেই এসেছি। কিন্তু বলো তো দেখি! তোমাদের মাঝে এই শক্তি আছে কি, আজ তোমরা আমায় তোমাদের নির্যাতনের লক্ষ্যে পরিণত করবে? সেই একই স্থান, যেখানে তোমরা আমাকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত অবস্থায় দেখতে চেয়েছিলে এবং আকাঙ্ক্ষা রাখতে- আমার জাতি আমাকে ধরে যেন এখানেই তোমাদের হাতে তুলে দেয়, সেখানে আমি এমন অবস্থায় এসেছি যে, শুধু আমার জাতিই নয় বরং গোটা আরবও আমার সাথে আছে এবং আমার জাতি আমাকে তোমাদের হাতে তুলে দেয় নি, বরং আমার জাতি তোমাদেরকেই আমার হাতে সোপর্দ করে দিয়েছে। খোদা তা'লার কী লীলা দেখুন! এই দিনটিও সোমবার ছিল, এই দিনটিতেই মহানবী (সা.) সওর গুহা থেকে বের হয়ে শুধুমাত্র হযরত আবু বকর (রা.)-কে সঙ্গে নিয়ে মদীনা অভিমুখে হিজরত করেছিলেন; এই দিনেই তিনি (সা.) আক্ষেপের সাথে সওর পাহাড় থেকে মক্কার দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন, হে মক্কা! তুমি আমার কাছে পৃথিবীর সকল জনবসতির চেয়ে অধিক প্রিয়, কিন্তু তোমার অধিবাসীরা আমাকে এখানে থাকতে দিল না।"

(দিবাচা তফসীরুল কুরআন, আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড-২০, পৃ: ৩৪৪-৩৪৫)

হযরত উম্মে হানী বিনতে আবী তালেব (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) যখন মক্কার উচ্চভূমিতে শিবির স্থাপন করেন তখন বনু মাখযুম (গোত্র) থেকে আমার শ্বশুরবাড়ির দুইজন আত্মীয় পালিয়ে আমার কাছে আসে। আমার ভাই হযরত আলী (রা.) আমার কাছে আসে এবং সে বলে, খোদার কসম! আমি এই দু ইজনকে হত্যা করব। আমি এই দুইজনকে আমার গৃহে আশ্রয় দিয়েছি। এরপর আমি স্বয়ং মহানবী (সা.)-এর নিকট মক্কার সেই উঁচু স্থানে আসি। আমি তাঁকে (সা.) পানির একটি পাত্র থেকে গোসল করতে দেখি যাতে মাখা আটার চিহ্ন বিদ্যমান ছিল এবং তাঁর (সা.) কন্যা হযরত ফাতেমা (রা.) একটি কাপড় দ্বারা তাঁর জন্য আড়ালের ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। গোসলের পর তিনি (সা.) তাঁর পোশাক পরিবর্তন করেন, এরপর চাশতের সময়ে আট রাকআত নামায পড়েন। এরপর তিনি (সা.) আমার দিকে তাকিয়ে বলেন, হে উম্মে হানী, স্বাগতম! তুমি কেন এসেছ? তিনি সেই দুই ব্যক্তি এবং হযরত আলী (রা.) সংক্রান্ত পুরো ঘটনা খুলে বলেন যে, এভাবে হযরত আলী (রা.) তাদেরকে হত্যা করতে চায়, কিন্তু আমি তাদেরকে আমার ঘরে লুকিয়ে রেখে এসেছি। তিনি (সা.) বলেন, যাদেরকে তুমি আশ্রয় দিয়েছ তাদেরকে আমরাও আশ্রয় দিচ্ছি এবং যাদেরকে তুমি নিরাপত্তা প্রদান করেছ তাদেরকে আমরাও নিরাপত্তা প্রদান করছি। অতএব,সে যেন ঐ দুইজনকে হত্যা না করে। অর্থাৎ মহানবী (সা.) বলেছেন, হযরত আলী তাদেরকে হত্যা করবে না। এই দুইজন ব্যক্তি হযরত উম্মে হানীর (রা.) শ্বশুরবাড়ির আত্মীয় হারেস বিন হিশাম ও আব্দুল্লাহ্ বিন রবী'আ ছিলেন।

(আসসীরাতুন নববিয়াহ লি ইবনে হিশাম, পৃ: ৭৪৩-৭৪৪) (সহীহ বুখারী, কিতাবুস সালাত, হাদীস-৩৫৭) (সুবুলুল হুদা ওয়ার রিশাদ, ৫ম খণ্ড, পৃ: ২৪৯-২৫০)

বুখারীর একটি রেওয়ায়েতে আছে, আব্দুর রহমান বিন আবী লায়লা (রা.) বর্ণনা করেন, আমার কাছে কেউ একথা বর্ণনা করেছে, উম্মে হানী ব্যতীত অন্য কেউ মহানবী (সা.)-কে চাশতের নামায পড়তে দেখে নি। অর্থাৎ এই রেওয়ায়েতটি কেবল উম্মে হানী বর্ণিত যে, মহানবী (সা.) চাশতের নামায পড়ছিলেন; এ ঘটনার আর কোনো সাক্ষী পাওয়া যায় না। হযরত উম্মে হানী (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) মক্কা বিজয়ের দিন তাঁর বাড়িতে আসেন এবং তিনি গোসল করেন আর আট রাকআত নামায পড়েন। আমি এরচেয়ে বেশি সংক্ষিপ্ত নামায আর দেখি নি, কিন্তু তিনি (সা.) পূর্ণরূপে রুকু ও সিজদা করতেন; এটি বুখারীর হাদীস।

(সহীহ বুখারী, আবওয়াবুত তাসতু, হাদীস-১১৭৬)

মহানবী (সা.) যে আট রাকআত নামায পড়েছেন, এটি কোন নামায ছিল- এ সম্পর্কে আলেমগণ বিভিন্ন মতামত ব্যক্ত করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন, এটি চাশত বা ইশরাকের নামায ছিল। কারো মতে এটি ইশরাকের নামায ছিল, আবার কারো মতে চাশতের নামায ছিল। কারো কারো মতে এটি 'বিজয়ের নামায' ছিল যা কোনো শহর বা দুর্গ ইত্যাদি জয়ের পর কৃতজ্ঞতাস্বরূপ পড়া হয়, আর একই রীতির অনুসরণে পরবর্তীকালে ইসলামের আমীরগণও বিভিন্ন (স্থান) জয়ের পর আট রাকআত নামায পড়তে আরম্ভ করেছিলেন। (আল লউলুল মাকনুন, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৫২)

আরেকটি অভিমত হলো, মক্কা বিজয়ের রাতে যেহেতু অতি গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয়াদি দৃষ্টিপটে ছিল, যার দরুন মহানবী (সা.) এত ব্যস্ত থাকেন যে, তাহাজ্জুদের নামায পড়ার সময় পান নি- তা তিনি (সা.) ঐ সময় অর্থাৎ সকালবেলা আদায় করেন। হয়ত এ কারণেই একটি ধর্মীয় মাসলা হলো, যদি কোনো কারণে তাহাজ্জুদ নামায না পড়া হয়ে থাকে, তাহলে সকালে সূর্যোদয়ের পরে আট রাকআত নামায পড়ে নেওয়া সমীচীন।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেছেন, "যদি তোমরা কোনো দিন তাহাজ্জুদের নামায পড়তে না পারো তাহলে (কমপক্ষে) ইশরাকের নামায পড়ে নিও।"

(খুতবাতে মাহমুদ, খণ্ড-২২, পৃ: ৪৭৭, প্রদত্ত, ১৯ শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪১)

মহান আল্লাহর বাণী

এবং লোকদের মধ্যে কতক এমন আছে যাহারা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের জন্য নিজেদের আত্মাকে বিক্রয় করিয়া দেয়, এবং নিশ্চয় আল্লাহ্ এইরূপ বান্দাগণের প্রতি অত্যন্ত মমতাশীল। (আল-বাকারা: ২০৮)

দোয়াপ্রার্থী: Wasia Begum, Harhari, Murshidabad

কোনো কোনো রেওয়ায়েতে এটিও দেখা যায়, তিনি (সা.) কোনো সময় তাহাজ্জুদ পড়তে না পারলে এর স্থলে ইশরাকের নামায পড়ে নিতেন।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) লুধিয়ানা নিবাসী মীর আব্বাস আলী সাহেবের উদ্দেশ্যে এক পত্রে লেখেন, "এই অধম পূর্বে লিখেছিল, আপনি আপনার রীতি অনুসারে সব যিকর আযকার অব্যাহত রাখুন। শুধুমাত্র এমন রীতিনীতি এড়িয়ে চলা উচিত যেগুলোতে কোনো প্রকার শিরক বা বিদআত রয়েছে। আল্লাহ্‌র রসূল (সা.) কর্তৃক ইশরাকের নামায সবসময় আদায় করা সাব্যস্ত নয়। এটি প্রমাণ হয় না যে, তিনি (সা.) নিয়মিত ইশরাকের নামায পড়তেন। তাহাজ্জুদ নামায ছুটে গেলে অথবা সফর থেকে ফিরে (ইশরাকের নামায পড়া) প্রমাণিত, কিন্তু ইবাদত-বন্দেগী করতে চেষ্টা করা আর সম্মানিত স্রষ্টার দ্বারে পড়ে থাকাই সুন্নত-সম্মত।"

(মাকতুবাতে আহমদ, ১ম খণ্ড, পৃ: ৫২৮, মকতুব নং-১৫)

অর্থাৎ ইবাদত-বন্দেগীর চেষ্টা অব্যাহত রাখা আর আল্লাহ্ তা'লার দরবারে পড়ে থাকাই হলো আসল সুন্নত।

মসজিদে হারামে প্রবেশ এবং তাওয়াফ করা সংক্রান্ত তথ্য হলো, মহানবী (সা.) দিনের কিছু অংশ তাঁর তাঁবুতে অবস্থান করেন। এরপর তিনি তাঁর উটনী 'কাসওয়া'কে আনতে বলেন। সেটিকে তাঁর তাঁবুর দরজার কাছে আনা হয়। তিনি (সা.) অস্ত্র নিতে এবং শিরস্ত্রাণ পরিধান করতে চলে যান। সাহাবীরা (রা.) তাঁর চতুষ্পার্শ্বে বৃত্তাকারে দণ্ডায়মান হন। মহানবী (সা.) তাঁর বাহনে আরোহণ করেন। খান্দামা থেকে হাজুন পর্যন্ত ঘোড়ার ঢেউ খেলানো সারি বিস্তৃত ছিল। মহানবী (সা.) সেই পথ দিয়ে যান। তাঁর সাথে হযরত আবু বকর (রা.) ছিলেন। তিনি তার সাথে কথা বলছিলেন। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) মক্কা বিজয়ের সময় ক্বাদা' পর্বতের দিক থেকে মক্কায় প্রবেশ করার সময় লক্ষ্য করেন, মহিলারা তাদের ওড়না দিয়ে ঘোড়াগুলোর মুখে আঘাত করে সেগুলোকে পেছনে সরিয়ে দিচ্ছে। তখন মহানবী (সা.) স্মিত হেসে হযরত আবু বকর (রা.)-র দিকে তাকিয়ে বলেন, হে আবু বকর (রা.), হাসসান বিন সাবিত কী লিখেছে? অর্থাৎ, হাসসান বিন সাবিত (রা.) কোনো কবিতা পাঠ করেছিলেন, সেটাই জানতে চান। অতএব, হযরত আবু বকর (রা.) সেই পঙ্‌ক্তিগুলো পাঠ করেন। যার অনুবাদ হলো, আমার প্রিয় কন্যা হারিয়ে যাক, অর্থাৎ আমার মন্দ হোক, যদি তুমি এমন সেনাবাহিনীকে ধুলো উড়াতে না দেখ, যেগুলোর প্রতিশ্রুত স্থান হলো ক্বাদা' পাহাড়। সেসব দ্রুতগামী ঘোড়া নিজেদের লাগাম ছিঁড়ে অনিয়ন্ত্রিত হওয়ার প্রয়াস পাচ্ছিল। নারীরা তাদের ওড়না দিয়ে (ঘোড়াগুলোকে) আঘাত করছিল। হযরত ইবনে উমর (রা.) ঘোড়াগুলোর এ চিত্রই অঙ্কন করেন আর তখন অবিকল একই ঘটনা ঘটছিল।

হযরত ইবনে উমর (রা.) এবং হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, মক্কা বিজয়ের দিন মহানবী (সা.) পবিত্র মক্কায় প্রবেশ করেন। কা'বাগৃহের চতুর্দিকে তখন প্রায় তিনশ ষাটটি প্রতিমা স্থাপিত ছিল যেগুলো সীসা গলিয়ে স্থাপন করা হয়েছিল। হুবল ছিল সবচেয়ে বড়ো প্রতিমা। এটি কা'বাগৃহের সামনে ছিল। ইসাফ ও নায়েলা সেখানে ছিল যেখানে লোকেরা পশু জবাই করত। মহানবী (সা.)-এর হাতে ধনুক ছিল। তিনি (সা.) ধনুকের এক প্রান্ত ধরেন। তিনি (সা.) যখনই কোনো প্রতিমার পাশ দিয়ে যেতেন তখন এটি (ধনুক) দিয়ে প্রতিমার চোখে আঘাত করতেন এবং বলতেন, جَآءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا (সূরা বনী ইসরাঈল: ৮২) অর্থাৎ "সত্য এসে গেছে এবং মিথ্যা পালিয়ে গেছে; নিশ্চয়ই মিথ্যা পলায়ন করারই ছিল।"

তিনি (সা.) কা'বাগৃহের কাছাকাছি পৌঁছেন এবং সেটি দেখেন। মহানবী (সা.) স্বীয় বাহনে চড়ে এগিয়ে যান আর নিজের লাঠি দিয়ে হাজরে আসওয়াদ স্পর্শ করেন এবং আল্লাহু আকবার বলেন। উত্তরে মুসলমানরাও তাকবীর ধ্বনি দেন। তারা (রা.) বার বার তকবীর ধ্বনি উচ্চকিত করতে থাকেন, এমনকি (গোটা) মক্কা নগরী আল্লাহু আকবার ধ্বনিতে প্রকম্পিত হতে থাকে। অতঃপর মহানবী (সা.) তাদেরকে নীরবতা অবলম্বনের ইঙ্গিত করেন। মুশরিকরা পাহাড়ের ওপর থেকে এই দৃশ্য দেখছিল। মহানবী (সা.) কা'বাগৃহ তাওয়াফ করেন। হযরত মুহাম্মদ বিন মাসলামা (রা.) উটনীর লাগাম ধরে রেখেছিলেন। মহানবী (সা.) হাজরে আসওয়াদের নিকটে আসেন, তা স্পর্শ করেন এবং কা'বা শরীফ তাওয়াফ করেন। তাওয়াফ শেষে তিনি (সা.) নিজ উটনীর পিঠ থেকে নীচে অবতরণ করেন।

হযরত ইবনে উমর (রা.) বর্ণনা করেন, আমরা মসজিদে উটনী বসানোর কোনো জায়গা পাই নি, ফলে তিনি (সা.) লোকদের হাতের ওপর ভর দিয়ে নামেন। [অর্থাৎ লোকেরা হাত বাড়িয়ে দেয় আর মহানবী (সা.) লোকদের হাতের ওপর পা রেখে উট থেকে নীচে নেমে আসেন।] পরে উটনীটিকে বাইরে নিয়ে যাওয়া হয়। হযরত মুআম্মার ইবনে আব্দুল্লাহ্ (রা.) আসেন এবং উটনীটিকে নিয়ে উপত্যকার দিকে চলে যান।

একটি বর্ণনায় আছে, মহানবী (সা.) মক্কা বিজয়ের সময় 'বাতাহা'তে থাকা অবস্থায় হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.)-কে আদেশ দেন, তিনি যেন কা'বা ঘরে প্রবেশ করেন এবং সেখানে থাকা সকল ছবি মুছে ফেলেন। যতক্ষণ না সব ছবি মুছে ফেলা হয়, ততক্ষণ মহানবী(সা.)-এর মধ্যে প্রবেশ করেন নি।

হযরত ইবরাহীম (আ.) ও হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর ছবিও বের করে দেওয়া হয়। তাদের উভয়ের হাতে ভাগ্য নির্ধারক চিহ্ন সম্বলিত তির ছিল। [তাদের ছবিও সেখানে বানিয়ে রাখা হয়েছিল কিংবা মূর্তি বানানো ছিল।] মহানবী (সা.) এসকল ছবি দেখে বলেন, আল্লাহ্ এই মূর্তি পূজারী ধ্বংস করুন! এ সকল মূর্তিপূজারী কিজানে- তারা উভয়ে [অর্থাৎ হযরত ইবরাহীম ও ইসমাঈল (আ.)] কখনো এগুলোর দ্বারা ভাগ্যনির্ধারণ করেন নি? [তাদের হাতে যে তির রয়েছে- এগুলো মিথ্যা ও বানোয়াট গল্পের ফলশ্রুতি; তারা কখনও এমনটি করেন নি।] মহানবী (সা.) মাকামে ইবরাহীম-এ আসেন। তিনি (সা.) বর্ম পরিহিত ছিলেন। তিনি (সা.) সেখানে দুই রাকাআত নামায আদায় করেন। এরপর তিনি যমযম কূপের নিকটে যান। হযরত আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিব (রা.) অথবা আবু সুফিয়ান বিন হারেস বিন আব্দুল মুত্তালিব (রা.) তাঁর (সা.)-এর জন্য এক কলস পানি তোলেন। তিনি (সা.) তা থেকে পানি পান করেন এবং ওযু করেন। সাহাবীরা দ্রুত মহানবী (সা.)-এর ওযুর সেই পানি হাত পেতে নিয়ে নিজেদের চোখে-মুখে মাখতে থাকে। মুশরিকরা অবাক হয়ে তাদের এই দৃশ্য দেখছিল এবং অবাক হচ্ছিল আর বলছিল, আমরা এত বড়ো বাদশার কথা পূর্বে কখনও শুনিও নি আর দেখিও নি! মক্কা বিজয়ের পর মহানবী (সা.) হুবল মূর্তিটি ভেঙে ফেলার নির্দেশ প্রদান করেন। তদনুযায়ী সেটি যখন ভেঙ্গে ফেলা হয়, আর এ সময় মহানবী (সা.) সেটির পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলেন, তখন হযরত যুবায়ের বিন আওয়াম (রা.) হযরত আবু সুফিয়ানকে বলেন, হে আবু সুফিয়ান! হুবলের মূর্তিটি ভেঙে ফেলা হয়েছে, অথচ তুমি উহুদের যুদ্ধের দিন একে নিয়ে অনেক দম্ভ করেছিলে। তুমি যখন এই ঘোষণা করেছিলে যে, সে তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছে [অর্থাৎ হুবল অনুগ্রহ করেছে।] তখন আবু সুফিয়ান বলে, হে আওয়ামের পুত্র! এসব কথা এখন বাদ দাও। কেননা আমি বুঝতে পেরেছি, মুহাম্মদ (সা.)-এর খোদা ছাড়া যদি অন্য কোনো খোদা থাকতো তাহলে আজ যা ঘটেছে- তা ঘটত না।

এরপর মহানবী (সা.) কা'বা গৃহের এক কোণে বসে পড়েন আর লোকেরা তাঁর (সা.) চারপাশে সমবেত হয়।

(সুনান আবু দাউদ, কিতাবুল লিবাস, হাদীস-৪১৫৬) (ফতেহ মক্কা, পৃ: ২৭০-২৭১) (সুবুলুল হুদা, ৫ম খণ্ড, পৃ: ২২৭,২৩৪-২৩৫) (সহীহ বুখারী, কিতাবুল মাগাযি, হাদীস-৪২৮৮)

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) মক্কা বিজয়ের দিন উপস্থিত হন এবং হযরত আবু বকর (রা.) নিরাপত্তার জন্য তাঁর (সা.) মাথার কাছে তরবারি হাতে দাঁড়িয়ে ছিলেন।

(মাজমুয়ায়েজ জোয়ায়েদ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ১৮৭)

হযরত ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, মহানবী (সা.) মক্কা বিজয়ের বছর উসামা বিন যায়েদের উটনীতে চড়ে মক্কায় আসেন, এরপর উসমান বিন তালহা (রা.)-কে ডেকে বলেন, আমার কাছে (কা'বা ঘরের) চাবি নিয়ে আসো। তিনি (রা.) তার মায়ের কাছে (চাবির জন্য) গেলে তার মা কা'বা গৃহের চাবি দিতে অস্বীকৃতি জানায়। তিনি (রা.) বলেন, খোদার কসম! তোমাকে অবশ্যই চাবি দিতে হবে; [নিজের মাকে এ কথা বলেন;] নতুবা এই তরবারি আমার পিঠ ভেদ করে যাবে। [অর্থাৎ অন্যথায় উক্ত চাবির জন্য আমার ওপর কঠোরতা করা হবে আর তোমার ওপরও কঠোরতা করা হবে আর অবশেষে তা দিতেই হবে।] বর্ণনাকারী [তথা হযরত ইবনে

যুগ ইমামের বাণী

অতএব, কুরআন শরীফ অনুধাবন করা এবং সেই অনুযায়ী হিদায়াত লাভের জন্য তাকওয়া প্রধান ও আবশ্যক বিষয়।

(মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃ: ১২১)

দোয়াপ্রার্থী: Late-Rafiquddin Ahmad & Afifa Begum, From- Lutful Haque Sb., Kandi (MSD)

মহান আল্লাহ্‌র বাণী

হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা সুদ খাইও না যাহা (ধন-সম্পদ ও অনিষ্টকে) বহুগুণে বৃদ্ধি করে এবং আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর যেন তোমরা সফলকাম হইতে পার। (আলে ইমরান: ১৩১)

দোয়াপ্রার্থী: Azizur Rahaman Sb, Lalbag, Murshidabad

উমর (রা.)] বলেন, তখন তিনি তাকে সেই চাবি দিয়ে দেন। তিনি (রা.)সেই চাবি নিয়ে মহানবী (সা.)-এর নিকটে আসেন এবং তাঁকে তা দিয়ে দেন। মহানবী (সা.) তখন সেই চাবি তাকে (রা.) ফিরিয়ে দেন, তারপর তিনি (রা.) দরজা খোলেন।(সহীহ মুসলিম, কিতাবুল হজ্জ, ৬ষ্ঠ, পৃ: ২৭৮, হাদীস-২৩৪৫)

মহানবী (সা.) উসামা বিন যায়েদ (রা.) এবং বিলাল বিন রাবাহ (রা.)-কে সাথে নিয়ে কা'বা গৃহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন। কা'বার চাবিবাহক উসমান বিন তালহা (রা.)-ও সাথে ছিলেন। মহানবী (সা.) কা'বার ফটক বন্ধ করে দেন এবং দীর্ঘক্ষণ কা'বার অভ্যন্তরে অবস্থান করেন আর সেখানে দুই রাকআত নামায আদায় করেন। হযরত আবদুল্লাহ্ বিন উমর (রা.) যিনি বাহিরে দরজার পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলেন, তিনি বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) যখন বাহিরে আসেন তখন আমি দ্রুত ভেতরে যাই আর আমি হযরত বিলাল (রা.)-কে জিজ্ঞেস করি,মহানবী (সা.) এখানে যখন এসেছিলেন তখন কী করেছিলেন? তিনি (রা.) বলেন, তিনি (সা.) একটি স্তম্ভ (তথা খুঁটি) ডান পাশে, আরেকটি খুঁটি বাম পাশে এবং পিছনে তিনটি খুঁটিরাখেন। বায়তুল্লাহ্তে তখন ছয়টি খুঁটি ছিল। তখন মহানবী (সা.) এমনভাবে নামায আদায় করেন যে, দুটি খুঁটির মাঝে দাঁড়িয়ে যান। সামনে একটি খুঁটি ছিল আর পেছনে ছিল তিনটি খুঁটি। একটি বর্ণনা অনুযায়ী, তিনি (সা.) দুটি খুঁটি তাঁর বামে এবং একটি খুঁটি তাঁর ডানে এবং তিনটি খুঁটি তাঁর পেছনে রাখেন। অর্থাৎ সামনে প্রথমে যে খুঁটি ছিল সেগুলোকে এমনভাবে ভাগ করেন যেন এক পাশে দুটি, আরেক পাশে একটি এবং পেছনের দিকে তিনটি থাকে। যাহোক, তিনি (সা.) সেখানে দুই রাকাআত নামায পড়েন। এটি সহীহ মুসলিমের বর্ণনা।

(সহীহ মুসলিম, কিতাবুল হজ্জ, হাদীস-২৩৪৪) (সহীহ বুখারী, কিতাবুস সালাত, হাদীস-৫০৪,৫০৫) (আল লাওলুল মাকনুন, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৫৮-৫৯)

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বর্ণনা করেন, মক্কায় প্রবেশ করার সময় হযরত আবু বকর (রা.) তাঁর (সা.) উটের লাগাম ধরে তাঁর সাথে কথা বলছিলেন আর তিনি (রা.) সূরা ফাতহ পাঠ করছিলেন, যার মাঝে মক্কা বিজয়ের ভবিষ্যদ্বাণী ছিল। তিনি (সা.) সোজা কা'বা শরীফের দিকে আসেন আর উটে আরোহিত অবস্থায় কা'বা ঘর সাতবার প্রদক্ষিণ করেন। তখন তাঁর (সা.) হাতে একটি লাঠি ছিল। তিনি (সা.) কা'বা ঘর প্রদক্ষিণ করেন যা হযরত ইবরাহীম (আ.) ও তাঁর ছেলে হযরত ইসমাইল (আ.) এক খোদার ইবাদতের জন্য নির্মাণ করেছিলেন, যেটিকে পরবর্তীতে তাঁদের পথভ্রষ্ট বংশধররা মূর্তির আখড়া বানিয়ে বসিয়েছিল। আর সেই তিনশ ষাটটি মূর্তি যেগুলো সেখানে রাখা ছিল- সেই প্রত্যেকটি মূর্তিতে তিনি (সা.) লাঠি দিয়ে আঘাত করছিলেন আর বলছিলেন, جَآءَ الۡحَقُّ وَزَهَقَ الۡبَاطِلُ اِنَّ الۡبَاطِلَ كَانَ زَهُوۡقًا (সূরা বনী ইসরাঈল: ৮২) এ ছিল সেই আয়াত যা হিজরতের পূর্বেই সূরা বনী ইসরাইলে মহানবী (সা.)-এর ওপর অবতীর্ণ হয়েছিল। আর যার মাঝে হিজরত আর পরবর্তীতে মক্কা বিজয় হবার সংবাদ দেওয়া হয়েছিল। পশ্চিমা গবেষকরা এ বিষয়ে একমত যে, এটি হিজরতের পূর্বের সূরা। এই সূরায় বর্ণনা করা হয়েছিল

وَقُلۡ رَّبِّ اَدۡخِلۡنِىۡ مُدۡخَلَ صِدۡقٍ وَّاَخۡرِجۡنِىۡ مُخۡرَجَ صِدۡقٍ وَّاجۡعَلۡ لِّىۡ مِنۡ لَّدُنۡكَ سُلۡطٰنًا نَّصِيۡرًا ۔ وَقُلۡ جَآءَ الۡحَقُّ وَزَهَقَ الۡبَاطِلُ اِنَّ الۡبَاطِلَ كَانَ زَهُوۡقًا (بنی اسرائیل:81)

(সূরা বনী ইসরাঈল: ৮১-৮২) অর্থাৎ তুমি বলো, হে আমার প্রতিপালক প্রভু ! তুমি আমাকে এই শহরে অর্থাৎ মক্কায় পুণ্যের সাথে প্রবেশ করাও; অর্থাৎ হিজরতের পর বিজয় দান করে; আর এই শহর থেকে মঙ্গলসহ বের কোরো; অর্থাৎ হিজরতের সময়; আর স্বয়ং তোমার নিকট থেকে আমার জন্যবিজয় এবং সাহায্যের উপকরণ প্রেরণ করো। আর এটি বলো যে, সত্য এসে গেছে আর মিথ্যা অর্থাৎ শিরক পরাজিত হয়ে পলায়ন করেছে, আর মিথ্যা অর্থাৎ শিরকের জন্য পরাজিত হয়ে পলায়ন করা তো চিরকালই নির্ধারিত ছিল। এই ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হওয়াএবং হযরত আবু বকর (রা.) যখন এই আয়াতগুলো পড়ছিলেন তখন মুসলমান ও কাফিরদের হৃদয়ে যে আবেগ সৃষ্টি হচ্ছিল- তা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। মোটকথা সেই দিন মাকামে ইবরাহীমকে পুনরায় কেবল এক খোদার ইবাদতের জন্য [পুনরুদ্ধার করে] নির্দিষ্ট করা হয় আর চিরকালের জন্য মূর্তি ভেঙে ফেলা হয়। মহানবী (সা.) যখন হুবল নামক মূর্তির ওপর তাঁর লাঠি দিয়ে আঘাত করেন আর সেটি স্থানচ্যুত হয়ে পড়ে যায়, তখন হযরত যুবায়ের (রা.) হযরত আবু সুফিয়ানের দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে বলেন, হে আবু সুফিয়ান!উহুদের সেই দিন তোমার স্মরণ আছে! মুসলমানরা যখন আঘাতে জর্জরিত হয়ে একদিকে দাঁড়িয়ে ছিল, তুমি তখন দম্ভভরে ঘোষণা করেছিলে, উলু হুবল, উলু হুবল! অর্থাৎ হুবলের মর্যাদা বৃদ্ধি হোক, হুবলের প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধি হোক। আর এটি বলছিলে, হুবলই উহুদের দিন মুসলমানদের মোকাবেলায় তোমাদের বিজয়ী করেছিল। আজকে দেখো! হুবল তোমার সম্মুখে টুকরো টুকরো হয়ে পড়ে আছে। আবু সফিয়ান বলে, হে যুবায়ের! এসব কথা বাদ দাও। আজ আমরা ভালোভাবে বুঝতে পারছি, হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর খোদা ব্যতীত যদি অন্য কোনো খোদা থাকতো, তাহলে আজ আমরা যা কিছু দেখছি- তা দেখতে হতো না।এরপর মহানবী (সা.) কা'বা গৃহের ভেতরে হযরত ইবরাহীম (আ.) ও অন্যান্যদের যে সবছবি ছিল, সেগুলো মুছে ফেলার নির্দেশ দেন এবং খোদা তা'লার কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ হওয়ায় কা'বা গৃহে দুই রাকআত নামায আদায় করে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। অতঃপর তিনি (সা.)বাহিরে এসে আরও দুই রাকআত নামায আদায় করেন। কা'বা গৃহের ছবিগুলো মুছে ফেলার জন্য মহানবী (সা.) হযরত উমরকে (রা.) নিযুক্ত করেছিলেন। তিনি (রা.) এই ধারণার বশে যে, হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে তো আমরাও নবী হিসাবে মান্য করি- হযরত ইবরাহীম(আ.)-এর ছবি অক্ষত রাখেন। মহানবী (সা.) যখন এই ছবি বহাল তবিয়তে দেখতে পান তখন বলেন, হে উমর! তুমি এটি কী করেছ? আল্লাহ্ তা'লা কি বলেন নি- مَا كَانَ اِبۡرٰهِيۡمُ يَهُوۡدِيًّا وَّلَا نَصۡرَانِيًّا وَّلٰكِنۡ كَانَ حَنِيۡفًا مُّسۡلِمًا وَّمَا كَانَ مِنَ الۡمُشۡرِكِيۡنَ (সূরা আলে ইমরান: ৬৮) অর্থাৎ ইবরাহীম (আ.) ইহুদীও ছিল না এবং খ্রিষ্টানও ছিল না, বরং সে ছিল আল্লাহ্র প্রতি সদা বিনত ও আত্মসমর্পণকারী, খোদা তা'লার সকল সত্যতা স্বীকারকারী এবং এক আল্লাহ্তে বিশ্বাসী বান্দা। অতএব মহানবী (সা.)-এর আদেশে সেই ছবিও মুছে ফেলা হয়।

আল্লাহ্ তা'লার নিদর্শনাবলি দেখে মুসলমানদের হৃদয় ঈমানে এতটাই পরিপূর্ণ হচ্ছিল এবং মহানবী (সা.)-এর প্রভাব-প্র তিপত্তির প্রতি তাদের বিশ্বাস এভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছিল যে, মহানবী (সা.) যখন যমযমের সেই ঝরনা থেকে- যা হযরত ইসমাঈল বিন ইবরাহীম (আ.)-এর পান করার জন্য আল্লাহ্ তা'লা নিদর্শনস্বরূপ নির্গত করেছিলেন- পানি পান করার জন্য আনিয়ে নেন এবং সেখান থেকে কিছু পানি পান করে অবশিষ্ট পানি দিয়ে তিনি (সা.) ওযু করেন, তখন তাঁর শরীর থেকে এক ফোঁটা পানিও মাটিতে পড়তে পারে নি। কেননা মুসলমানরা তৎক্ষণাৎ তা হাত পেতে নিয়ে নিচ্ছিল এবং বরকত হিসাবে নিজের শরীরে মাখছিল। আর (এই দৃশ্য দেখে) মুশরিকরা বলছিল, আমরা পৃথিবীতে এমন কোনো বাদশা দেখি নি যার সাথে তার জাতির লোকদের এতটা হৃদ্যতা রয়েছে!"

(দিবাচা তফসীরুল কুরআন, আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড-২০, পৃ: ৩৪৫-৩৪৭)

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন: এ বিষয়টি ভালোভাবে স্মরণ রেখো যে, কা'বা গৃহে যেমন হাজরে আসওয়াদ স্থাপন করা আছে, ঠিক তেমনি মানুষের বুকের ভেতরে হৃদয় বসানো আছে। [এখানে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদের হৃদয়কে হাজরে আসওয়াদের সাথে তুলনা করছেন।] তিনি (আ.) বলেন, এক সময় যেমন বায়তুল্লাহ্তে কাফিররা মূর্তি স্থাপন করে দিয়েছিল; বায়তুল্লাহ্র জন্য এমন সময় না-ও আসতে পারতো, কিন্তু এমনটি হয় নি; বরং আল্লাহ্ তা'লা এটিকে একটি দৃষ্টান্ত হিসেবে রেখেছেন। মানব হৃদয়ও হাজরে আসওয়াদের মতো এবং মানুষের বুক বায়তুল্লাহ্ সদৃশ। আল্লাহ্ ছাড়া অন্য সব চিন্তা কা'বার ভেতরে রাখা মূর্তির মতো। [অর্থাৎ হৃদয়ে আল্লাহ্ ছাড়া অন্য যে-সব ধ্যানধারণা আসে- সেগুলো সব মূর্তি।] পবিত্র মক্কার মূর্তিগুলো সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস তখনই হয়েছিল, যখন আমাদের নবী (সা.) দশ হাজার পবিত্রাত্মা ব্যক্তির সমন্বয়ে গঠিত জামা'তের সাথে সেখানে প্রবেশ করেছিলেন এবং মক্কা বিজিত হয়েছিল। সেই দশ হাজার সাহাবীদের পূর্ববর্তী গ্রন্থাবলিতে ফেরেশতা আখ্যা দেওয়া হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে তাদের পদমর্যাদা ফেরেশতা তুল্যই ছিল। মানুষের শক্তি-সামর্থ্যও একভাবে ফেরেশতার পদমর্যাদাতুল্য। যেভাবে ফেরেশতাদের এই পদমর্যাদা রয়েছে যে, يَفۡعَلُوۡنَ مَا يُؤۡمَرُوۡنَ(النحل:51) (অর্থাৎ তাদেরকে যে আদেশ দেওয়া হয়, তারা তা পালন করে;)

মহান আল্লাহ্র বাণী

নিশ্চয় আল্লাহ্ তিনি, যিনি পরম রিয্কদাতা, শক্তির অধিকারী, সুদৃঢ়। (আয যারিয়াত: ৫৯)

দোয়াপ্রার্থী: Abdur Rahaman Sb. Berhampur, Murshidabad

যুগ খলীফার বাণী

প্রত্যেক জীবই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করিবে। এবং নিশ্চয় কিয়ামতের দিনই কেবল তোমাদিগকে তোমাদের কর্মের পূর্ণ প্রতিদান দেওয়া হইবে। (আলে ইমরান: ১৮৬)

দোয়াপ্রার্থী: Humayun Kabir Molla, Nalhati, Birbhum

অনুরূপভাবে মানবীয় শক্তির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, যে আদেশ তাদের দেওয়া হয় তারা সেগুলোর ওপর আমল করে। এভাবেই যাবতীয় শক্তিসামর্থ্য এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গ মানবীয় আদেশের অধীন। সুতরাং আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য সমস্ত প্রতিমার পরাজয় এবং মূলোৎপাটনের জন্য এভাবে তাদের ওপর আক্রমণ করা আবশ্যক। এই বাহিনী আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে প্রস্তুত হয়ে থাকে এবং বিজয় তাকেই দেওয়া হয় যে আত্মশুদ্ধি করে। কুরআন শরীফে বর্ণিত হয়েছে قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰىهَا (الشّمس:10) (অর্থাৎ যে ব্যক্তি এর উৎকর্ষ সাধন করেছে সে নির্ঘাত সফল হয়েছে)। হাদীসেও বর্ণিত হয়েছে, হৃদয়ের সংশোধন যদি হয়ে যায় তবে সারা দেহের সংশোধন হয়ে যায়। আর এটা কেমন অদ্ভুত ব্যাপার! চোখ, কান, হাত, পা, জিহ্বা ইত্যাদি সব অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আসলে অন্তরের (তথা হৃদয়ের) আদেশেই কাজ করে। কোনো একটা চিন্তা মনে আসে, তারপর তা যে অঙ্গ-সম্পর্কিত হয়, সেই অঙ্গ সাথে সাথে তা বাস্তবায়নের জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়।" (মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ১৭২-১৭৩)

মসীহ্ মওউদ (আ.) এভাবে উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়েছেন, তোমাদের হৃদয়ের মূর্তিগুলোকেও ভেঙে ফেলো, তাহলেই তোমরা প্রকৃত মুমিন হতে পারবে। মহানবী (সা.) সেখানে বক্তৃতাও প্রদান করেছিলেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসূলু ল্লাহ্ (সা.) মক্কা বিজয়ের দিন বলেছিলেন, এখন আর হিজরত নেই, কিন্তু জিহাদ ও নিয়্যত রয়েছে। আর যখন তোমাদের জিহাদের জন্য বের হওয়ার আদেশ দেওয়া হবে তখন তোমরা বের হবে। আর এই মক্কা নগরীকে আ ল্লাহ্ তা'লা সেই দিন থেকেই পবিত্র ঘোষণা করেছেন যে-দিন তিনি আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। কিয়ামত পর্যন্ত এটা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে পবিত্র থাকবে। আমার আগে কাউকে এই শহরে যুদ্ধ করার অনুমতি দেওয়া হয় নি এবং আমাকেও কেবল এক নির্দিষ্ট দিনের কিছুটা সময়ের জন্য অনুমতি দেওয়া হয়েছে। এই শহর কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহ্র আদেশে পবিত্র থাকবে। এখানকার কাঁটাযুক্ত কিছুও তোলা যাবে না; এর শিকারি জীবজন্তু কে ধাওয়া করা যাবে না অর্থাৎ ভয় দেখানো যাবে না; কোনো পড়ে থাকা জিনিস তোলা যাবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত কেউ সেটা চিনিয়ে না দেয়। আর এর ঘাসও কাটা যাবে না। হযরত আব্বাস (রা.) বলেন, হে আল্লাহ্র রসূল! শুধুমাত্র 'ইযখির' নামক ঘাস যদি কাটা যেত! [ইযখির এক ধরনের ঘাস।]কারণ এটা তাদের কারিগরদের কাজে লাগে এবং তা তাদের বাড়িঘরের জন্য প্রয়োজন হয়। মহানবী (সা.) বললেন, ঠিক আছে, শুধু ইযখির কাটা যাবে, তা-ও তোমাদের প্রয়োজনের জন্য।(সহীহ বুখারী, কিতাবুল জিযইয়া, হাদীস-৩১৮৯)

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, আল্লাহ্ তা'লা যখন তাঁর রসূল (সা.)-কে মক্কা বিজয় দান করলেন, তখন তিনি (সা.) লোকদের মাঝে দাঁড়িয়ে আল্লাহ্র প্রশংসা ও গুণকীর্তন করেন। এরপর তিনি (সা.) বলেন, নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'লা হস্তীবাহিনীর হাত থেকে মক্কাকে রক্ষা করেছেন এবং তিনি তাঁর রসূল ও মুমিনদেরকে এই নগরীর ওপর বিজয় দান করেছেন। আমার আগে কারো জন্য তা হালাল ছিল না এবং আমার জন্যও তা দিনের একটি স্বল্প সময়ের জন্য হালাল করা হয়েছিল; আর আমার পরেও কারো জন্য তা বৈধ হবে না। অর্থাৎ মক্কা বিজয়ের দিন যুদ্ধ করা শুধুমাত্র অল্প কিছু সময়ের জন্য বৈধ ছিল, এরপর থেকে তা আর কখনো বৈধ হবে না। তাই মক্কার কোনো শিকার ধাওয়া করে ধরা যাবে না, কোনো গাছের কাঁটাও ভাঙা যাবে না, কোনো পড়ে থাকা জিনিস কুড়িয়ে নেওয়া যাবে না, তবে যদি কেউ ঘোষণা করে (মালিক খুঁজে দেওয়ার উদ্দেশ্যে নেয়)- তাহলে তা বৈধ। আর যদি কেউ কাউকে হত্যা করে তবে সে (অর্থাৎ নিহত ব্যক্তির পরিবার) দুটি বিষয়ের মধ্যে যে-কোনো একটি বেছে নিতে পারবে- ফিদিয়া (প্রাণের বিনিময়ে ক্ষতিপূরণ) অথবা কিসাস (প্রতিশোধ)। এসময় হযরত আব্বাস (রা.) বলেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! শুধু 'ইযখির' ঘাস ছাড়া, কারণ আমরা তা আমাদের কবর ও ঘরবাড়িতে ব্যবহার করি। তখন রসূলুল্লাহ্ (সা.) বললেন, ঠিক আছে, 'ইযখির' ছাড়া। সেটি কাটতে পারো। আবু শাহ নামে একজন ব্যক্তি ছিলেন, যিনি ইয়েমেনবাসীদের একজন ছিলেন। তিনি নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আমার জন্য লিখে দিন। আল্লাহ্র রসূল (সা.) বললেন, আবু শাহের জন্য লিখে দাও। বর্ণনাকারী বলেন, আমি আওযায়ী-কে জিজ্ঞেস করলাম, তার এই কথার অর্থ কী ছিল যে, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আমার জন্য লিখে দিন? তিনি বলেন, এর অর্থ হলো, মহানবী (সা.) যে ভাষণ বা খুতবা দিলেন, সেটা যেন তাকে লিখে দেওয়া হয়। অতঃপর সেটি লিখে তাকে দেওয়া হলো।(সহীহ বুখারী)

সীরাত ইবনে হিশাম -এ লেখা আছে, রসূলুল্লাহ্ (সা.) কা'বা শরীফের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বলেন, আল্লাহ্ ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কেউ নেই। তিনি এক, তাঁর কোনো শরীক নেই। তিনি তাঁর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করে দেখিয়েছেন এবং একাই সব দলকে পরাজিত করেছেন। হে লোকসকল! সকল গর্ব, সমস্ত প্রতিশোধ এবং যত রক্ত প্রবাহিত হয়েছে- তা আজ আমার এই দুই পায়ের নীচে রয়েছে। তবে কেবল কা'বা ঘরের চাবির দায়িত্ব এবং যমযম কূপ থেকে পানি পান করানোর দায়িত্ব যাদের কাছে আগে ছিল- তাদের কাছেই থাকবে। হে লোকসকল! যদি কেউ ভুলক্রমে কাউকে মেরে ফেলে, যেমন লাঠি বা চাবুক দিয়ে- তাহলে পূর্ণ রক্তপণ দিতে হবে, যা ১০০ উটের সমপরিমাণ। হে কুরাইশ! আল্লাহ্ তোমাদের কাছ থেকে অজ্ঞ যুগের অহংকার ও গর্ব দূর করে দিয়েছেন, যা পিতৃপুরুষদের কারণে প্রদর্শন করা হতো। এখন আর কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই। সব মানুষ আদম-সন্তান, আর আদম সৃষ্টি হয়েছিলেন মাটি থেকে। অতঃপর তিনি (সা.) এ আয়াতটি তিলাওয়াত করেন,

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوْا اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ

অর্থ: "হে মানবজাতি! নিশ্চয় আমরা নর ও নারী থেকে তোমাদের সৃষ্টি করেছি। আর আমরা তোমাদেরকে বিভিন্ন গোষ্ঠী ও গোত্রে তোমাদের বিভক্ত করেছি, যেন তোমরা একে অপরকে চিনতে পারো। তোমাদের মাঝে আল্লাহ্র দৃষ্টিতে নিঃসন্দেহে সে-ই সর্বাধিক সম্মানিত, যে তোমাদের মাঝে সর্বাধিক মুত্তাকী।" (সূরা হুজুরাত: ১৪)

হে কুরাইশ! আমি তোমাদের সাথে কী আচরণ করব বলে তোমরা মনে করো? কুরাইশ বলল, আপনি যা করবেন তা নিশ্চয় উত্তমই হবে; [যারা তখনো মুসলমান হয় নি-তারা একথা বলেছিল;] আপনি একজন সম্মানিত ভাই এবং সম্মানিত ভাইয়ের সন্তান। মহানবী (সা.) বললেন, তাহলে যাও, তোমরা সবাই মুক্ত। (সীরাতে ইবনে হিশাম, পৃ : ৭৪৪)

এক বর্ণনায় এসেছে, তিনি (সা.) বলেছিলেন-

أَقُوْلُ كَمَا قَالَ يُوْسُفُ: لَا تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ ,

আমি সেই কথাই বলব যা হযরত ইউসুফ (আ.) বলেছিলেন, 'আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই। আল্লাহ্ তোমাদের ক্ষমা করুন, আর তিনিই তো সর্বাধিক দয়ালু।' লোকেরা সাধারণ ক্ষমার এই ঘোষণার কথা শুনে এমনভাবে বেরিয়ে এলো যেন তারা কবর থেকে জীবিত হয়ে উঠেছে এবং তারা দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করতে শুরু করল। তারা একথা শুনে সঙ্গে সঙ্গে ইসলাম গ্রহণ করতে আরম্ভ করে।

(আস সুনানুল কুবরা লিল বাইহাকি, ৯ম খণ্ড, পৃ: ২০০, হাদীস-১৮২৭৫)

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) মক্কাবাসীদের ক্ষমা করার প্রসঙ্গে এই ঘটনার বর্ণনা এভাবে দেন: মহানবী (সা.) যখন এ কথাগুলো শেষ করলেন এবং মক্কার লোকদেরকে তাঁর সামনে উপস্থিত করা হলো তখন তিনি বললেন, হে মক্কাবাসীরা! তোমরা দেখেছ, আল্লাহ্র নিদর্শনগুলো কীভাবে অক্ষরে অক্ষরে সত্য হয়েছে! এখন বলো, তোমরা যে অত্যাচার এবং শত্রুতা আল্লাহ্র একত্ব বাদে বিশ্বাসী গরিব বান্দাদের ওপর করেছ, তার কী প্রতিদান দেওয়া উচিত? মক্কার লোকেরা বলল, আমরা আপনার কাছে সেই আচরণই প্রত্যাশা করি, যা ইউসুফ (আ.) তাঁর ভাইদের সাথে করেছিলেন। এটা আল্লাহ্র কুদরত ছিল যে, মক্কার লোকদের মুখ থেকে সেই একই কথা বের হলো, যার ভবিষ্যদ্বাণী আল্লাহ্ তা'লা আগেই সূরা ইউসুফে করে রেখেছিলেন। আর মক্কা বিজয়ের দশ বছর আগেই একথা বলে দিয়েছিলেন, তুমি মক্কাবাসীদের সাথে একই রকম আচরণ করবে যেমনটি ইউসুফ তার ভাইদের সাথে করেছিল। অতঃপর যখন মক্কার লোকদের মুখ থেকেই একথার সত্যায়ন হয়ে গেল যে, রসূলু ল্লাহ্ (সা.) ইউসুফ (আ.)-এর সদৃশ এবং আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে (সা.) ইউসুফ (আ.)-এর মতোই নিজ ভাইদের ওপর বিজয় দান করেছেন, তখন তিনি (সা.) ঘোষণা করলেন: لَا تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ - আল্লাহ্র কসম, আজ তোমাদেরকে কোনো শাস্তি দেওয়া হবে না আর কোনো ধিক্কারও দেওয়া হবে না। "

(দিবাচা তফসীরুল কুরআন, আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড-২০, পৃ: ৩৪৭-৩৪৮)

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন: মহানবী (সা.) যখন মক্কা বিজয় করলেন তখন সমস্ত কাফিরদের ধরে এনে তাঁর সামনে উপস্থিত করা হলো। কাফিররা নিজের মুখেই স্বীকার করল, তাদের কঠোর অপরাধের কারণে তারা মৃত্যুদণ্ডযোগ্য এবং তারা নিজেদেরকে তাঁর (সা.) দয়ার ওপর ছেড়ে

যুগ ইমামের বাণী

খোদা তোমাদের সঙ্গে থাকবেন, যদি তোমরা মুত্তাকি হও এবং তাকওয়ার সূক্ষ্ম পথসমূহে বিচরণ কর।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ২০০)

দোয়াপ্রার্থী: Sk.Fayjal Sb. and Family
Jaynagar, Bankura, WB

দিল। তখন তিনি (সা.) সবাইকে ক্ষমা করে দিলেন এবং এই ক্ষমা পাওয়ার জন্য ইসলাম গ্রহণের কোনো শর্তও আরোপ করেন নি, কিন্তু তারা তাঁর (সা.) এই মহানুভবতা দেখে স্বতঃস্ফূর্তভাবে মুসলমান হয়ে গেল।"

(চাশমায়ে মারেফাত, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২৩, পৃ: ২৩৫)

অতঃপর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আরেক স্থানে বলেন: মহানবী (সা.)-এর নৈতিক শক্তির উৎকর্ষ কেবল তখনই হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব যখন সেই যুগের অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করা হয়। বিরোধীরা তাঁকে এবং তাঁর (সা.) অনুসারীদের যে পরিমাণ কষ্ট দিয়েছে, আর এর বিপরীতে এমন অবস্থায় যখন তিনি (সা.) পূর্ণ ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব লাভ করেছিলেন, তখন তিনি (সা.) তাদের সাথে যে আচরণ করেছেন- তা তাঁর (সা.) মহানুভবতাকে প্রকাশ করে। এমন কোনো কষ্ট নেই যা আবু জাহল ও তার সহযোগীরা তাঁকে এবং তাঁর নিবেদিতপ্রাণ অনুসারীদের দেয় নি। দরিদ্র মুসলিম নারীদের উটের সাথে বেঁধে বিপরীত দিকে হাঁকিয়ে দেওয়া হতো, যার ফলে তারা দ্বিখণ্ডিত হয়ে যেত- শুধুমাত্র এই অপরাধে যে, তারা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' কলেমায় কেন ঈমান এনেছে! কিন্তু তিনি (সা.) এর বিপরীতে ধৈর্য ও সহনশীলতা অবলম্বন করেছেন। যখন মক্কা বিজয় হয় তখন তিনি (সা.) لَا تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ (অর্থাৎ, আজকের দিনে তোমাদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই) বলে ক্ষমা করে দিলেন। এটি এমন এক নৈতিক উৎকর্ষ যা অন্য কোনো নবীর মাঝে দেখা যায় না। اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ

(মালফুযাত ১ম খণ্ড, পৃ: ৪৮৫)

তিনি (আ.) আরো বলেন, মক্কায় যে-সকল লোকেরা কষ্ট দিয়েছিল, তিনি (সা.) যখন মক্কা-বিজয় করলেন, তখন চাইলে তাদের সবাইকে হত্যা করতে পারতেন; কিন্তু তিনি (সা.) দয়া প্রদর্শন করলেন এবং لَا تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ বলে দিলেন। তিনি (সা.) ক্ষমা করা মাত্রই সকলে মুসলমান হয়ে গেল। এত মহান ও উত্তম নৈতিক গুণাবলি কি অন্য কোনো নবীর মাঝে পাওয়া যায়? কখনোই না! ঐ সকল লোক- যারা মহানবী (সা.)-কে, তাঁর (সা.) আত্মীয়স্বজন ও সাহাবীদেরকে অত্যন্ত কষ্ট দিয়েছিল এবং ক্ষমার অযোগ্য যন্ত্রণা দিয়েছিল, তিনি (সা.) শাস্তি দেওয়ার পূর্ণ ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তৎক্ষণাৎ তাদের ক্ষমা করে দেন। অথচ যদি তাদেরকে শাস্তি দেওয়া হতো তবে তা সম্পূর্ণ ভাবে ন্যায়বিচার ও ইনসাফের অন্তর্ভুক্ত হতো, কিন্তু তিনি (সা.) সে সময় তাঁর ক্ষমা ও মহানুভবতার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেন। এগুলো এমন বিষয় ছিল যা মুজিযা ছাড়াও সাহাবীদের ওপর গভীর প্রভাব ফেলেছিল। এ কারণেই তিনি (সা.) 'মুহাম্মদ' (অতি প্রশংসিত) নামের যথার্থ প্রতীক হয়েছিলেন (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)। পৃথিবীতে তাঁর প্রশংসা করা হতো, আর একইভাবে ঊর্ধ্বলোকেও তাঁর প্রশংসা করা হতো; ঊর্ধ্বলোকেও তিনি (সা.) 'মুহাম্মদ' ছিলেন। তাঁর (সা.) এই নামটি আল্লাহ্ তা'লা বিশ্ববাসীর জন্য একটি আদর্শরূপে প্রদান করেছেন। তিনি (আ.) বলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ এ ধরনের নৈতিক গুণাবলি নিজের মধ্যে সৃষ্টি না করে, ততক্ষণ কোনো লাভ হয় না। আল্লাহ্ তা'লার প্রকৃত ভালোবাসা মানুষ নিজের মাঝে পূর্ণভাবে সৃষ্টি করতে পারে না, যতক্ষণ না সে মহানবী (সা.)-এর উন্নত নৈতিক গুণাবলি ও জীবনপদ্ধতিকে নিজের জন্য পথপ্রদর্শক ও আলোকবর্তি কা হিসেবে গ্রহণ করছে।"

(মালফুযাত, ২য় খণ্ড, পৃ: ৪২৫-৪২৬)

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ

অবশিষ্ট ঘটনাবলি পরবতীতে বর্ণনা করব।

এখন আমি দুইজন প্রয়াত ব্যক্তির স্মৃতিচারণ করতে চাই এবং পরবতীতে তাদের গায়েবানা জানাযা পড়াব।

প্রথম স্মৃতিচারণ হলো সৈয়দা লুবনা আহমদ সাহেবার। তিনি মরহুম সৈয়দ মওলুদ আহমদ সাহেবের স্ত্রী ছিলেন। কিছুদিন পূর্বে ৭১ বছর বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেছেন, اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ । আল্লাহ্ তা'লার ফযলে তিনি মূসীয়া ছিলেন। কেন্দ্রীয় পর্যায়ে নয়, তবে নিজের মহল্লা ও হালকা পর্যায়ে লাজনা ইমাইল্লাহ্তে তিনি সেবা করার সুযোগ পেয়েছেন। তাঁর বিয়ে হয়েছিল সৈয়দ মওলুদ আহমদ সাহেবের সাথে, যিনি সাহেবযাদী আমাতুল হাকীম বেগম সাহেবা ও সৈয়দ দাউদ মুজাফফর শাহ সাহেবের পুত্র ছিলেন। তাদের বিয়ে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আস-সালেস (রাহে.) পড়িয়েছিলেন। যেহেতু এতে কিছু নসীহতও রয়েছে, তাই আমি বিয়ের খুতবার কিছু অংশও পাঠ করছি। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আস-সালেস (রাহে.) বলেন; [এটি বর্তমান যুগের বিয়েশাদির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য]: বৈবাহিক সম্পর্ক গাছের কলমের মতো। শুরুতে একে খুব সাবধানে লালনপালন করতে হয়। কুরআনের নির্দেশনা অনুযায়ী, এই কলমকে 'কওলে সাদীদ' (সত্য ও সঠিক কথা)-এর সুতো দিয়ে বেঁধে রাখতে হয়, তবেই এর সুরক্ষা সম্ভব। আর এই দায়িত্ব শুধু স্বামী-স্ত্রীর ওপরই নয়, বরং তাদের পরিবার, তাদের পরিবেশ এমনকি তাদের বন্ধুবান্ধবের ওপরও বর্তায়। কারণ অনেক ধরনের অনিষ্ট মন্দ ধারণার কারণে, গীবতের ফলে, ধৈর্যহীনতা কিংবা ক্রোধের কারণে সৃষ্টি হয়। এসব থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য 'কওলে সাদীদ' একটি অত্যন্ত শক্তিশালী বন্ধনসূত্র।

এরপর তিনি বলেছিলেন, আল্লাহ্ করুন, আমি এখন যে বিবাহের ঘোষণা দিচ্ছি, সেটি উভয় পরিবারের জন্য অত্যন্ত কল্যাণকর হোক, জামা'তের জন্য কল্যাণকর হোক এবং মানবজাতির জন্যও কল্যাণকর হোক, এর মাধ্যমে ধর্মসেবক বংশধারা বহমান হোক। আমার সাথে যেহেতু তাদের আত্মীয়তার সম্পর্কও ছিল, তাই আমি জানি, হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আস-সালেস (রাহে.)-র এই বাক্যগুলোকে মোহতরমা লুবনা সাহেবা নিজ আত্মীয়তার অধিকার আদায়ের ক্ষেত্রে শিরোধার্য করার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন। এরপর তিনি (রাহে.) এটিও বলেন, আজকে আমি যে বিয়ের ঘোষণা দিচ্ছি, তা আমার ছোটো বোন আমাতুল হাকীম সাহেবা এবং সৈয়্যদ দাউদ মুজাফফর শাহ সাহেবের পুত্র সৈয়্যদ মওলুদ আহমদ। আর কনে হলেন, ডাক্তার সৈয়্যদ গোলাম মুজতবা সাহেবের কন্যা। ডাক্তার সাহেব যেহেতু ওয়াকেফে যিন্দেগী (জীবন উৎসর্গকারী) ডাক্তার ছিলেন, শুরুতে আফ্রিকায় ছিলেন। শুরুতে যখন নুসরত জাহাঁ স্কিমের ঘোষণা করা হলো তখন জীবন উৎসর্গকারী ডাক্তারদের মাঝে তিনি প্রথম সারিতে ছিলেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) ডাক্তার সাহেবের উল্লেখ করেন, ডাক্তার সাহেব সেসব প্রারম্ভিক ডাক্তারদের মাঝে একজন, যারা পশ্চিম আফ্রিকায় জীবন উৎসর্গকারী ডাক্তার হিসেবে কাজ করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা তার দোয়াসমূহ শ্রবণ করেছেন, তার হাতে আরোগ্য রেখেছিলেন এবং অত্যন্ত সফল শল্যবিদ (সার্জন) হিসেবে তিনি ঘানায় কাজ করেছেন। এরপর নাইজেরিয়াতেও কাজ করেছেন। (খুতবাতে নাসের, ১০ম খণ্ড, পৃ: ৭৭১-৭৭২)

সৈয়্যদা লুবনা সাহেবার পুত্র সৈয়্যদ সউদ আহমদ, তিনিও ওয়াকেফে যিন্দেগী এবং বর্তমানে তিনি ফযলে উমর হাসপাতালের প্রশাসক। তিনি নিজ মায়ের অবস্থা সম্পর্কে বলেন, যখন আমার নানা নুসরত জাহাঁ স্কিমের অধীনে ঘানার অসোকরে যান, তখন পরিবারও সাথে ছিল; আমার মা অর্থাৎ লুবনা সাহেবাও ছিলেন। তখন তিনি ছোটো ছিলেন। [এটি লুবনা সাহেবার বিবাহের পূর্বের ঘটনা।] সে সময় যেহেতু সেখানে কোনো চিকিৎসার উপকরণ পাওয়া যেত না, তাই তিনি কিছু কাপড়ের টুকরো (ব্যান্ডেজ হিসেবে) কেটে কেটে দিতেন; বিদ্যুৎ ছিল না, ডাক্তার সাহেব টর্চের আলোতে অপারেশন করতেন। এই মেয়েও টর্চ নিয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে থাকতেন যেন ডাক্তার সাহেব সেই আলোয় অপারেশন করতে পারেন। তিনি লেখেন, অনেক আদর করতেন, নিজ কষ্ট ভুলে গিয়ে অন্যদের সেবা করতেন। নিজ স্বামী, পিতা-মাতা, শ্বশুর-শাশুড়ি সবার অধিকার উত্তমরূপে প্রদান করেছেন এবং সত্যিকার অর্থেই প্রদান করেছেন। ১৯৮৬ সালে সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়েছিলেন, কোমরে ব্যথা ছিল। এরপর ক্যানসারও হয়ে গিয়েছিল। ডায়াবেটিসের সমস্যাও ছিল। কিন্তু কখনো কষ্টের বহিঃপ্রকাশ করেন নি। অত্যন্ত ধৈর্যের সাথে নিজের অসুস্থতা পার করেছেন। এমনভাবে চলাফেরা করতেন যেন সুস্বাস্থ্যের অধিকারিণী। নিজ সন্তানদের, পৌত্র-পৌত্রীদের, দৌহিত্র-দৌহিত্রীদের দোয়াও শেখাতেন। বিশেষভাবে প্রতিদিন যারা তার সাথে থাকতো- সেসব পৌত্র-পৌত্রীদের। তার দৃষ্টিশক্তি দুর্বল হয়ে গিয়েছিল। যখন তিলাওয়াত করতে পারতেন না তখন অনলাইনে পবিত্র কুরআনের তিলাওয়াত শুনতেন। মিটিংগুলোতে নিয়মিত যেতেন। একবার তাকে কেউ বলে, আপনি তো অসুস্থ, মিটিংয়ে কেন আসেন? তিনি বলেন, মিটিং হচ্ছে আর আমি যাব না! জামা'তের ব্যবস্থাপনার আনুগত্য আমার করা উচিত। জামা'তের আনুগত্যের অনুভূতি প্রবল ছিল। যেহেতু তিনি আমার (অর্থাৎ হুযূরের) স্ত্রীর ভাবী ছিলেন, তাই আমিও তাকে দেখেছি, আড়ম্বরহীন ছিলেন এবং সব রকম অবস্থার সাথে মানিয়ে নিয়ে জীবনযাপন করতেন। শ্বশুরপক্ষের অধিকার উত্তমরূপে প্রদান করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা তার সাথে ক্ষমা ও দয়ার আচরণ করুন। তার এক পুত্র ও এক কন্যা রয়েছে। যেভাবে আমি বলেছি, তার পুত্র ওয়াকেফে যিন্দেগী। আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকেও নিজ পিতা-মাতার পদাঙ্ক অনুসরণ করার সামর্থ্য দান করুন।

শেষাংশ শেষের পাতায়....

মহান আল্লাহর বাণী

হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা সকলেই পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণের আওতায় প্রবেশ কর এবং শয়তানের পদাংক অনুসরণ করিও না, সে নিশ্চয় তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। (আল-বাকারা: ২০৯))

দোয়াপ্রার্থী: Azkarul Islam, jamat Ahmadiyya Amaipur (Birbhum)

মক্কা বিজয়ের নেপথ্য কাহিনী

মূল: হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.)

(৩য় ও শেষ পর্ব.)

–অনুবাদক: মোরতোজা আলি, বড়িশা

মক্কার গোষ্ঠী প্রধানদের মধ্যে অস্থিরতা

কিছুদিন পর্যন্ত মদিনা থেকে সংবাদ পৌঁছিল না। যখন কোন খবর পৌঁছিল না, তাহাতে তাদের উদ্বেগ আরও বেশি বৃদ্ধি পেয়ে গেল। যদি খোজায়ারা সেখানে গিয়ে থাকে, তাহলে তো মহম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সা.) কিছু না কিছু অবশ্যই বলে থাকবেন। হয়ত বা বলবেন, আমি করতে পারব না বা বলবে, করছি। কিছু তো জানা চাই, চুপচাপ কেন? কিছু তো জ্ঞাত হওয়া চাই, এই নীরবতা কি প্রকারের? তিন-চারদিন পর তারা আবু সুফিয়ানকে বলল, 'তুমি প্রতিদিন যাতায়াত ও প্রদক্ষিন করে দেখ, মুসরমানেরা কোন সৈন্য-সামন্ত নিয়ে আসছে কি না।

মক্কা বিজয়ের জন্য রসুল করীম (সা.)-এর প্রস্তুতি।

যাহাহোক আবু সুফিয়ান মক্কার দিকে রওয়ানা হল, ওুদিকে রসুল করীম (সা.) নিজের এক স্ত্রীকে বললেন, যাত্রা করার জন্য আমার মালপত্র বাঁধাবাঁধি আরম্ভ কর। তিনি যাত্রা করার জন্য মাল-পত্র বাঁধা আরম্ভ করে দিলেন। হযরত আয়েশা (রা.) কে বললেন, আমার জন্য ছাতু, শস্যবীজ ইত্যাদি ভাজা করে প্রস্তুত কর। এই ধরণের খাদ্য তখনকার দিনে হত। হযরত আবু বকর (রা.) মেয়ের বাড়িতে এলেন, তিনি এইসব প্রস্তুতি দেখে হযরত আয়েশা (রা.) কে জিজ্ঞাসা করলেন, এই সব কি হচ্ছে? রসুলুল্লাহ (সা.)-এর কোন সফরের প্রস্তুতি কি? বললেন, মনে হচ্ছে সফরের প্রস্তুতি। তিনি বললেন, কিছুই জানি না। রসুলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, আমার সফরের মাল-পত্র প্রস্তুত কর এবং আমরা এই সব করছি। দু-তিন পর তিনি (সা.) হযরত আবু বকর (রা.) ও হযরত উমর (রা.) কে ডেকে বললেন, দেখ! খোজায়ার লোকেরা এইভাবে এসেছিলেন এবং আবার বললেন, এই ঘটনা ঘটেছে। খোদা তা'লা আমাকে এই ঘটনার পূর্বেই সংবাদ দিয়েছিলেন। আমরা তাদের সঙ্গে সন্ধি করেছিলাম, তারা আমাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। এটা ঈমান বিরুদ্ধ। আমরা মক্কাবাসীদের বাহাদুরী ও শক্তি দেখে সেখানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে প্রস্তুত হব না। আমাদের সেখানে যেতে হবে। তোমাদের অভিমত কি? হযরত আবু বকর (রা.) বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আপনি তো তাদের সঙ্গে সন্ধি করেছেন এবং তারা আপনার স্বজাতি।উদ্দেশ্য এই ছিল, আপনি কি স্বজাতিকে মারবেন? বললেন, আমি স্বজাতিকে মারব না, সন্ধিভঙ্গকারীদের মারব। তারপর হযরত উমর (রা.) কে জিজ্ঞাসা করলেন, তিনি বললেন, বিসমিল্লাহ! আমি প্রতিদিন দোয়া করতাম, ভাগ্যক্রমে এইদিন আসুক, আমরা রসুলুল্লাহ্ (সা.) -এর নিরাপত্তায় কাফেরদের বিরুদ্ধে লড়তে পারি। রসুলুল্লাহ্ (সা.) বললেন, আবু বকর অত্যন্ত কোমল প্রকৃতির লোক। কিন্তু সত্য কথা ওমর (রা.) এর জিহ্বা থেকে অনেক বেশি নির্গত হয়। বললেন, প্রস্তুত কর। তিনি (সা.) বললেন, আশেপাশের গোষ্ঠীদের উদ্দেশ্যে ঘোষণা করে জ্ঞাত করলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও রসুলের প্রতি ঈমান রাখে, তারা যেন রমযান মাসের প্রথমদিকে মদিনয়া একত্রিত হয়। অতএব, সৈন্য-সামন্ত একত্রিত হতে আরম্ভ হল এবং কয়েক হাজার লোকের সৈন্য প্রস্তুত হয়ে গেল ও তিনি (সা.) যুদ্ধ করার জন্য আগমণ করলেন।

খোদার 'নওবত খানা' (ঢাক-ঢোল পিটিয়ে ঘোষণা কক্ষ) অপেক্ষা কাফেরদের 'নওবত খানা'র মধ্যে একটি বড় পার্থক্য।

এখন দেখ, এই বাদ্যঘর কত জোরালো। ঐ সময় যখন এই সন্ধি হয়, তখন অঙ্গীকার বলেছিল, আমরা অন্তর থেকে এই সন্ধি করছি এবং খোদার অভিসম্পাত হোক আমাদের উপর যদি আমরা এই সন্ধি ভঙ্গ করি। সেখানে এক রাত অতিবাহিত হওয়ার পর খোদা তা'লা জ্ঞাত করেন যুদ্ধ হবে। এইরূপে নওবত খান বেজে যায়, সংবাদ আসে যুদ্ধ হবে। ওদিকে কাফেরদের নওবত খানার এই অবস্থা, আবু সুফিয়ান তিন দিন কাটিয়ে আসে। আর তিনি কিছুই জানেন না যুদ্ধ হবে। ফিরে যাবার পর জাতির উদ্দেশ্যে বলেন, আমি এই সব করে এসেছি। তিনি বললেন,যুদ্ধ তো হবে না? এদিকে তিনি মক্কায় পৌঁছিলেন, ওদিকে দশ হাজার সৈন্য প্রস্তুত। ইতিহাসে আহযাবের যুদ্ধছাড়া এতবড় সৈন্যদল আরবদের ইতিহাসে প্রস্তুত হয় নি। আহযাবে দশ-বারো হাজার লোক ছিল। এইরূপে আরবদের ইতিহাসে এতবড় সৈন্যদলের এটা দ্বিতীয় উদাহরণ। কিন্তু মদিনা থেকে এতবড় সৈন্যদল বেরিয়েছে, তা কারো কাছে কোন সংবাদ নেই। পুনরায় আল্লাহ্ তা'লা অলৌকিকভাবে প্রদর্শন করান, আমি এই বাদ্যঘর বাজাচ্ছি, যেটা আমার।আর এই বাদ্যঘরকে ভেঙ্গে দিচ্ছি, যেটা আমার। অতএব, রসুল করীম (সা.) তখন বাহির হয়ে বলেন, হে আমার খোদা! আমি তোমার কাছে দোয়া করছি, তুমি মক্কাবাসীদের কানকে বধির করে দাও, আর তাদের গুপ্তচরদের অন্ধ করে দাও, না তারা আমাদের দেখতে পায়, না তাদের কানে আমাদের কথা পৌঁছয়। সুতরাং তিনি (সা.) বাহির হলেন। মদিনায় শত শত মোনাফেক (কপট) বিদ্যমান ছিল। কিন্তু দশ হাজার সৈন্যদল মদিনা থেকে বাহির হলো আর কোন তথ্য মক্কায় পৌঁছিল না।

একজন সাহাবীর মক্কার দিকে চিঠি ও তার ধৃত হওয়া

শুধু একজন দুর্বল চিত্তের সাহাবী মক্কায় চিঠি লিখে দিয়েছিল। রসুল করীম (সা.) দশ হাজার সৈন্য-সামন্ত নিয়ে বেরিয়েছেন। আমি জানি না তিনি (সা.) কোথায় যাচ্ছেন। কিন্তু আমি অনুমান করছি, সম্ভবতঃ তিনি (সা.) মক্কার দিকে আসছেন। মক্কাতে আমার কিছু আত্মীয় ও প্রিয়জন আছে। আমি আশা করছি এই দুঃসময়ে তাকে সাহায্য করবে ও তাদেরকে কোনরকম কষ্ট দেবে না। এই চিঠি তখনও মক্কায় পৌঁছায় নি, রসুল করীম (সা.) সকাল বেলায় আলী (রা.) ডেকে বললেন, তুমি অমুক জায়গায় যাও। আল্লাহ্ তা'লা আমাকে বলেছেন,সেখানে উটের উপর এক মহিলা আরোহীকে দেখতে পাবে। তার কাছে একটা চিঠি প্যাবে, যা সে মক্কার দিকে নিয়ে যাচ্ছে। তুমি ওই চিঠিটা তার কাছ থেকে নিয়ে নিবে এবং অবিলম্বে আমার কাছে নিয়ে আসবে। যখন তিনি [হযরত আলী (রা.)] মক্কা অভিমুখে রওয়ানা হলেন, তখন হযরত রসুল করীম (সা.) বললেন, দেখ তিনি একজন মহিলা, কড়াকড়ি করো না, পিড়াপিড়ী ও চাপ দিয়ে বলবে, তোমার কাছে চিঠি আছে। কিন্তু তার পরেও সে অস্বীকার করে এবং কাকুতি মিনতি করেও যদি কাজ না হয়, তারপর তুমি কঠোরতা অবলম্বন করতে পার। যদি হত্যা করতে হয়, তাও করতে পার, কিন্তু চিঠি যেতে দিও না। অতএব, হযরত আলী (রা.) সেই স্থানে পোঁছে গেলেন। মহিলাটি উপস্থিত ছিলেন। সে কাঁদতে শুরু করল ও কসম খেতে লাগল। বলল, আমি কি বিশ্বাসঘাতক ও ধোকাবাজ। আমার কাছে কী-ই বা আছে, তল্লাশি করে দেখ। সুতরাং তিনি (রা.) এদিক-ওদিক দেখলেন, পকেট ও জিনিসপত্র দেখলেন, কিন্তু চিঠি পাওয়া গেল না। সাহাবা (রা.)রা বললেন, মনে হচ্ছে এর কাছে চিঠি নেই। হযরত আলী (রা.) আবেগ প্রবণ হয়ে বললেন, তোমরা চুপ কর, অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে বললেন, খোদার কসম! রসুল করীম (সা.) কখনও মিথ্যা বলতে পারেন না। অতএব, তিনি (রা.) সেই মহিলাকে বললেন, মহম্মদ রসুলুল্লাহ (সা.)বলেছেন, তোমার কাছে চিঠি আছে। খোদার কসম! আমি মিথ্যা বলছি না। তারপর তিনি তরবারি বের করে বললেন, ওহে তুমি সোজাসুজি চিঠি বের করে দাও, অন্যথায় স্মরণ রাখ, যদি তোমাকে উলঙ্গ করে তল্লাশি নিতে হয়, তাহলে আমি তোমাকে উলঙ্গ করাব, কেননা রসুল করীম (সা.) সত্যিকথা বলেছেন এবং তুমি মিথ্যা বলছ। সুতরাং সে ভয় পেয়ে গেল। যখন তাকে উলঙ্গ করার ধমক দেওয়া হল, তৎক্ষণাৎ নিজের চুলের খোঁপা খুরে যেখানে চিঠি ছিল, বের করে দিয়ে দিল। এটা হাতিব (রা.) নামে এক সাহাবীর চিঠি ছিল। তাতে লেখা ছিল, মুহাম্মদ (সা.) দশ হাজার সৈন্য-সামন্ত নিয়ে আসছেন, জানি না কোন দিকে যাচ্ছেন। কিন্তু এত বড় সৈন্যদল মক্কা ছাড়া আর কোথায় যেতে পারে তা জানি না। এইজন্য তোমাকে সংবাদ দিচ্ছি। যখন রসুল করীম (সা.) এর কাছে এই চিঠি পোঁছাল, তখন তিনি (সা.) হাতিব (রা.) কে ডাকলেন এবং বললেন, এই চিঠি তোমার? সে বলল, হ্যাঁ আমার। তিনি (সা.) বললেন, তুমি এই চিঠি কেন লিখেছিলে? তিনি বললেন, হে রসুলুল্লাহ! আসল কথা হল, সমস্ত মোহাজের যারা আপনার সাথে এসেছে, এরা মক্কাবাসী। আমিও মক্কার বাইরে থেকে এসেছিলাম। আমার কোন আত্মীয় স্বজন নেই, আমার সেখানে স্ত্রী ও পুত্র আছে। যখন আক্রমণ হবে, তখন আমর সমস্ত আত্মীয়স্বজন ও স্ত্রী-পুত্রকে

মহান আল্লাহ্র বাণী

তুমি বল,'হে রাজ্যাধিপতি আল্লাহ্! তুমি যাহাকে চাহ রাজত্ব দান কর এবং যাহার নিকট হইতে চাহ রাজত্ব কাড়িয়া লও।

(আলে ইমরান:২৭)

দোয়াপ্রার্থী: Golam Mustafa Sb., Berhampur, Murshidabad

রক্ষা করার কেউ নেই। এই জন্য আমি এই চিঠি লিখেছি। যদি ধ্বংস হওয়ার থাকে ও খোদা বলে ধ্বংস হোক,তাহলে তারা ধ্বংস হয়ো যাবে। আমি জানি খোদা তা'লা আপনাকে সাহায্য করবেন। আমি বেইমান নই। হযরত উমর (রা.) দাঁড়িয়ে ছিলেন্ তিনি তরবারি বের করে বললেন, হতভাগা! রাতদিন আমরা গোপনে চলে আসছি, কোন কথা যেন বাইরে না যায়, আর তুমি তাদের চিঠি লিখেছ। হে রসুলুল্লাহ্ (সা.) আমাকে অনুমতি দিন, আমি তার গর্দন উড়িয়ে দিব। তিনি (সা.) বললেন, ইনি যা বলছে, সত্য কথা বলছেন। ইনি মোমেন (বিশ্বাসী)। সে শুধু ভয়ে এই কাজ করেছে। যাইহোক এই অভিযোগ কারো কাছে পৌঁছয় নি। নওবতখানা বাজলেও তার আওয়াজ সেখানেই বন্ধ করে দেওয়া হয়। এদিক থেকে 'নওবত খানা' দেড় বছর আগে থেকে বাজত, শত্রু এসে গিয়েছে, শত্রু এসে গিয়েছে।

আবু সুফিয়অনের হতবুদ্ধি হওয়া

এক্ষণে যে সময় মুসলমানরা সেখানে পৌছিল, যতক্ষণ পর্যন্ত মুসলমানেরা 'হেরেম'-এ না পৌঁছিল ততক্ষণ মক্কাবাসীদের কাছে সংবাদ পৌঁছিল না। যখন সেখানে পৌঁছিল, তখন তো আবু সুফিয়ান ও তার দলবলদের মক্কাবাসীদের পক্ষ থেকে পাহারা নিযুক্ত ছিল। যেন এই পরিস্থিতি হল, যখন সেখানে পৌঁছাল তখন সংবাদ পৌঁছে গেল, ইসলামী সৈন্যরা এসে গিয়েছে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা তার উপায় বের করে দেন। তিনি (সা.) সেখানে গিয়ে বললেন, এখন আমাদের প্রকাশ করে দেওয়া উচিত, আমরা এসে গিয়েছি।

সুতরাং তিনি (সা.) আদেশ দিলেন, প্রত্যেক সৈন্য রুটির জন্য আলাদা আলাদা আগুন জ্বালাবে, যদ্বারা দশ হাজার আলো হবে। সুতরং সমস্ত তাঁবুর সামনে দশ হাজার আলো দেখা গেল। আবু সুফিয়ান আর তার সাথীসঙ্গীরা আগুনের উজ্জ্বলতা দেখে হতভম্ব হয়ে গেল। এতবড় সৈন্যদল তাদের ধ্যান-ধারণায় ছিল না। এই হতবুদ্ধিতায় আবু সুফিয়ান নিজ সাথীসঙ্গীদের বললেন, তোমরা কি অনুমান করতে পার, এরা কাদের সৈন্যদল? প্রথতে তো 'খোজায়াদের বিষয়ে ধারণা করা হল। তিনি বললেন, হয়ত খোজায়ারা হবে, যারা প্রতিশোধ নিতে এসেছে, আবু সুফিয়ান বললেন, খোদাকে ভয় কর, খোজায়ারা তো এর দশভাগের একভাগও নয়। এটা এতবড় আলো ও এতবড় সৈন্যদল, খোজায়াদের এর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কোন শক্তি-সামর্থ নেই। সাধারণত একটা তাঁবুতে একটা আলো থাকে, এইভাবে দশহাজার তাঁবু নির্মিত হল। খোজায়াদের মোট সংখ্যা দুই থেকে চারশত। এটা কেমন করে হতে পারে, এদের সংখ্যা তো তাদের তুলনায় কিছুই নয়। তিনি বললেন, অমুক গোষ্ঠী হবে, তারা কেন আসবে। আর সংখ্যাও এত নয়। মোট কথা এই রকম পাঁচ-সাতটা নাম নিতে থাকলেন, অমুক হবে, তমুক হবে। প্রত্যেক বার আবু সুফিয়ান বললেন, এইসব ভুল। অবশেষে বললেন, মহম্মদ (সা.)-এর সৈন্যদল হবে, আর কাদের হবে? বললে, সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা। আমি তো মদিনায় তাকে (সা.) নিদ্রিত অবস্থায় ছেড়ে এসেছি। হয়ত তিনি অত্যন্ত আরামের সাথে বসে আছেন।

আবু সুফিয়ান ও তার সঙ্গীরা ইসলামী প্রহরীদের পরিবেষ্টনের মধ্যে

এই কথা যখন হচ্ছিল, তখন ইসলামী সৈন্যদলের কয়েকজন সৈন্য পাহারায় নিযুক্ত ছিলেন। তারা পাহারা দিতে গিয়ে কাছাকাছি আবু সুফিয়ানের আওয়াজ শুনতে পেলেন। এদের মধ্যে হযরত আব্বাস (রা.)ও ছিলেন, যিনি রসুল করীম (সা.)-এর চাচা ও আবু সুফিয়ানের অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। তিনি ঐ সময় রসুল করীম (সা.)-এর খচ্চরে আরোহী ছিলেন। রসুল করীম (সা.) এই সফরে তাকে খচ্চর দিয়েছিলেন, যা তিনি ব্যবহার করতেন। তিনি আওয়াজ শুনে বললেন, আবু সুফিয়ান! আবু সুফিয়ান বললেন, আব্বাস তুমি কোথায়? হযরত আব্বাস বললেন, ও হতভাগা, তুমি অকৃতকার্য হও। মোহম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সা.) দশ হাজার সৈন্যদল নিয়ে এসেছেন। এখন শহর ধ্বংস হয়ে যাবে। এক্ষণে তুমি চল, আমার পিছনে বস আর খোদার নামে ব্রত কর, জাতির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর নতুবা বিপদ এসে যাবে। তিনি তার হাত ধরে খচ্চরের পিছনে বসিয়ে নিলেন ও খচ্চ দৌড়াতে থাকল। সৈন্যদের মধ্যে জায়গায় জায়গায় পাহারা থাকে। যেখানেই পৌঁছাচ্ছে পাহারাদার তৎক্ষণাৎ সামনে এসে আটকাচ্ছে। যখন তারা দেখলেন রসুলুল্লাহ (সা.)-এর খচ্চর এবং এর সামনে হযরত আব্বাস (রা.) বসে আছেন, তখন তারা বললেন, ছেড়ে দাও। যাইহোক, তিনি পাহারা থেকে বেরিয়ে চলে গেলেন। এমনকি হযরত উমর (রা.)-এর তাঁবু পর্যন্ত পৌঁছে গেলেন।

আবু সুফিয়ানকে হযরত আব্বাস (রা.) এর বাঁচানোর চেষ্টা

হযরত ওমর (রা.) দ্রুত গতিতে তরবারি নিয়ে বাহির হয়ে বললেন, খোদার প্রতি কতই কৃতজ্ঞতা বিনা প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে আমি আজ তার প্রাণ নাশ করতে সামর্থ লাভ করছি। স্বয়ং খোদা শত্রুকে আমার হাতে প্রদান করেছেন। হযরত আব্বাস (রা.) দেখলেন, সে সামনের দিকে পালাচ্ছেন। হযরত ওমর (রা.) পিছন পিছন ছিলেন। রসুল করীম (সা.)-এর তাঁবুর কাছে পৌঁছিলে হযরত আব্বাস (রা.) আবু সুফিয়ানকে ধাক্কা দিয়ে নীচে ফেলে দিয়ে বললেন, নীচে নেমে পড়। তারপর তিনি লাফিয়ে তার হাত ধরে রসুল করীম (সা.)-এর তাঁবুতে পৌঁছে বললেন, হে রসুলুল্লাহ্! আবু সুফিয়ান মুসলমান হওয়ার জন্য এসেছে। এখন আবু সুফিয়ান হতভম্ব হয়ে ভাবল, অজ্ঞানতাবশতঃ এ কি হয়ে গেল। আমি তো পাহারা দিচ্ছিলাম, আমাকে মুসলমান হওয়ার জন্য বলা হচ্ছে। রসুল করীম (সা.) নীরব থাকলেন, কেননা তার চেহারা দেখে বোঝা যাচ্ছিল, সে মুসলমান হতে আসে নি। এমন সময় হযরত উমর (রা.) প্রবেশ করলেন এবং বললেন, হে রসুলুল্লাহ্! এটা খোদা তা'লার কত বড় অনুগ্রহ, এই পাপী, বেইমান, আল্লাহ্ ও রসুলের শত্রু, প্রতিজ্ঞা ও সন্ধি ভঙ্গকারীকে খোদা আমার তত্ত্বাবধানে দিয়ে দিয়েছেন। আপনি (সা.) অনুমতি দিন, আমি তার গর্দান উড়িয়ে দিই। রসুল করীম (সা.) নীরব থাকলেন। কিন্তু হযরত আব্বাস (রা.) রাগান্বিত হলেন। কেননা তিনি তার বড় বন্ধু ছিলেন। তিনি উমর (রা.) কে বললেন, ওমর! দেখ, এ আমার বংশের লোক। এইজন্য তুমি তাকে মারতে চাইছ। যদি তোমার বংশের লোক হত তাহলে তুমি কখনই তাকে মারতে ইচ্ছা প্রকাশ করতে না। হযরত ওমর (রা.) অশ্রুপাত করে বললেন, আব্বাস! তুমি আমার উপর খুব বাড়াবাড়ি করেছ। খোদার কসম! যখন তুমি মুসলমান হয়েছিলে, তখন আমি এত আনন্দিত হয়েছিলাম, যদি আমার পিতাও মুসলমান হত, তাহলে আমি কখনও এত আনন্দিত হতাম না আর একমাত্র কারণ এটাই ছিল যে, যা আমি বুঝেছিলাম, তোমার মুসলমান হওয়াতে রসুলুল্লাহ্ (সা.) যতটা আনন্দিত হয়েছিলেন, তা আমার পিতার ইসলাম গ্রহণের পরে নয়। অর্থাৎ আমি তো নিজের বাপ-দাদাদের কথা ছেড়ে দিলাম, এখন আত্মীয়-স্বজনদের কি প্রশ্ন আছে। কিন্তু রসুল করীম (সা.) নীরব থাকলেন। কিছুক্ষণ পরে তিনি (সা.) বললেন, আব্বাস! আবু সুফিয়ানকে নিজের তাঁবুতে নিয়ে যাও এবং রাত্রিতে নিজের কাছে রাখ। সকাল বেলায় আমার সামনে হাজির করাও। হযরত আব্বাস (রা.) আবু সুফিয়ানকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন ও রাতে নিজের কাছে রাখলেন।

মুসলমানদের একত্রে ইবাদত, আবু সুফিয়ানের উপর গভীর প্রভাব

এখন দেখ, আবু সুফিয়ান পাহারা দিচ্ছিলেন এবং ফিরে সংবাদ প্রদান করার কথা ছিল। কিন্তু তিনি বন্দী হয়ে গেলেন। ওদিকে অবশিষ্ট মুসলমান সৈন্যরা অন্যদেরক বন্দী করলেন। এরা চার-পাঁচজন গোষ্ঠীপ্রধান ছিলেন। বন্দীরা যেখানে পৌঁছিলেন, সেখানেই রাতের বেলায় থাকলেন। প্রভাতে নামাযের সময় হযরত আব্বাস (রা.) আবু সুফিয়ানকে ধরে নিয়ে গেলেন। যখন আযান হল ও নামাযের জন্য লোকেরা দাঁড়াল তখন সে এক আশ্চর্যজনক দৃষ্টি প্রত্যক্ষ করল। এখানে জলসা সালানায় দেখ, আমাদের এখানে যখন ত্রিশ-চল্লিশ হাজার লোক নামাযের জন্য দাঁড়ায়, তখন কত জমকাল দৃশ্য হয়। সেখানেও সারিবদ্ধ হওয়া আরম্ভ হয়ে গেল এবং প্রত্যেক ব্যক্তি নামাযের জন্য দন্ডায়মান হল। আমাদের এখানে নামাযের সময় কিছু লোক পাকোড়া থেকে থাকে।কিন্তু তারা পাকা নামাযি ছিল। যাইহোক আবু সুফিয়ান যখন

যুগ ইমামের বাণী

সেই সময় দূর নয় বরং অতি নিকটেই যেদিন তোমরা আকাশ থেকে ফিরিশতাদের ফৌজ এশিয়া ,ইউরোপ ও আমেরিকার মানুষের মনে অবতীর্ণ হতে দেখবে। (ফতেহ ইসলাম, রূ-খা, খণ্ড-৩, পৃ: ১২)

দোয়াপ্রার্থী: Sayen Mir and Family, Kogram, Nalhati (Birbhum)

মহানবী (সা.)-এর বাণী

সদকা কখনও কারো সম্পদ হ্রাস করে নি আর আল্লাহ্ তা'লা ক্ষমা দানের কারণে বান্দার সম্মান বৃদ্ধিই করে থাকেন।

(সহী মুসলিম, কিতাবুর বির ওয়াসসিলাহ ওয়াল আদাব)

দোয়াপ্রার্থী: Shujauddin and family, Barisha (Kolkata)

তাদের দেখল, সে শিহরিত হয়ে উঠল। আবু সুফিয়ান বাদশাহের দরবারে আসা-যাওয়া করত আর সে জ্ঞাত ছিল, যখন কোন উচ্চ পদস্থ লোককে মারা হত, তখন সৈন্য দাঁড় করিয়ে তাদের সামনে ঘাড় কাটা হত। এই ধারণার বশবর্তী হয়ে সে জিজ্ঞাসা করল, আব্বাস! রাতে আমার সম্বন্ধে কোন নতুন নির্দেশ বলবৎ হয়েছে? হযরত আব্বাস (রা.) বললেন, তোমার সম্বন্ধে কোন নতুন নির্দেশ বলবৎ হয় নি। সে বলল, তাহলে এতলোক কেন দাঁড়িয়ে আছে? হযরত আব্বাস (রা.) বললেন, এরা 'ইবাদত' করার জন্য দাঁড়িয়ে আছে। আমাদের এখানে ইবাদতের এটাই পদ্ধতি। অল্পক্ষণ পর তারা রুকুতে গেল। সে বলল, ঝুঁকে গেল কেন? আব্বাস বললেন, এটাই ইবাদত। তার সেজদায় গেলে জিজ্ঞাসা করল, এ কি হল, সবাই ভূতলে পড়ে গেল কেন? আব্বাস বললেন, দেখছ না মোহাম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সা.) সেজদা করছেন। যেহেতু তিনি যা করেন, মুসলমানরা তাই করে। বললেন, অদ্ভুত পদ্ধতি, হযরত মহম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সা.) ঝুঁকছেন তো তারাও ঝুঁকে পড়ছেন, দাঁড়াচ্ছেন তো দাঁড়িয়ে পড়ছেন। তিনি বললেন, মুসলমানেরা এই রকমই করেন। মোহাম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর প্রতিটি গতিবিধি তারা অনুকরণ করেন। আবু সুফিয়ান বলত থাকল, আমি তো রোম সম্রাটের কাছে গিয়েছি ও অন্যান্য সম্রাটদের কাছেও গিয়েছি। আমি তো তাদের এই প্রকারের ইবাদত করতে দেখি নি। তিনি বললেন, রোম কি এমন, যদি মোহাম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সা.) বলে দেন রুটীতে হাত দেবে না, পানিতে হাত দেবেনা, তারা ক্ষিদে-পিপাসায় মরে যাবে, কিন্তু রুটিও খাবে না পানিও খাবে না।

রসুল করীম (সা.) এর নিকট আবু সুফিয়ানের নিবেদন

যখন নমায সমাপ্ত হল তখন হযরত আব্বাস (রা.) আবু সুফিয়ানকে নিয়ে রসুলুল্লাহ্ (সা.) এর মজলিসে উপস্থিত হলেন। রসুল করীম (সা.) আবু সুফিয়ানকে দেখে বললেন, দয়া হোক। এখনও কি বিশ্বাস হয় নি, খোদা এক। আবু সুফিয়ান বললেন, বিশ্বাস নেই কেন? যদি অন্য কোন খোদা থাকত তাহলে আমাদের সাহায্য করত। তিনি (সা.) বললেন, দয়া হোক। তোমার কি? এখনও কি বিশ্বাস হয় নি, মোহাম্মদ (সা.) আল্লাহ্‌র রসুল? আবু সুফিয়ান বলল, এ সম্পর্কে এখনও বিশ্বাস হয় নি। হযরত আব্বাস (রা.) বললেন, হতভাগা! 'বয়আত কর'। এক্ষণে যাতে তোমার ও তোমার জাতির প্রাণ রক্ষা পায়। বললেন, আচ্ছা! করছি। সে তো সেখানে ঘটনাক্রমে বয়আত করেছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে খাঁটি মুসলমান হয়েছিল। বেশ তো বয়আত করেছ। আব্বাস (রা.) বললেন, এক্ষণে নিজ জাতির জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা কর নতুবা তোমাদের জাতি চিরকালের জন্য ধ্বংস হয়ে যাবে। মোহাজেদের অন্তর ভীত হয়ে যাাচ্ছিল। তারা তো মক্কাবাসী ছিলেন। তারা মনে করল, একবার মক্কার সম্মান নষ্ট হলে পুনরায় মক্কার সম্মান অবশিষ্ট থাকবে না। তারা নিদারুন অত্যাচার সহ্য করা সত্ত্বেও দোয়া করল, কোনও রকমে সন্ধি হোক। কিন্তু তাদের তুলনায় আনসারদের মধ্যে অত্যন্ত আবেগ ও উন্মাদনা ছিল। মোহাম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সা.) বললেন, অনুগ্রহ প্রার্থনা কর। তারা বললেন, হে রসুলুল্লাহ্! আপনি কি নিজ জাতির উপর করুণা প্রদর্শন করবেন না। আপনি তো অত্যন্ত অনুগ্রহশীল, আমরা তো আপনার আত্মীয় ও ভাই, আমারও মর্যাদা থাকা উচিত, আমি মুসলমান হয়েছি। তিনি বললেন, আচ্ছা যাও এবং মক্কাতে ঘোষণা কর, যে ব্যক্তি আবু সুফিয়ানের ঘরে ঢুকে পড়বে, তাকে আশ্রয় দেওয়া হবে। তিনি বললেন, আমার ঘর আর কত বড়। সেখানে কত মানুষের সংকুলান হবে। এতবড় শহর, আমার ঘরে কোথায় আশ্রয় দিতে পারি। তিনি (সা.) বললেন, আচ্ছা যে ব্যক্তি কাবা শরীফে চলে যাবে তাকে আশ্রয় দেওয়া হবে। আবু সুফিয়ান বললেন, হে রসুলুল্লাহ্ (সা.) তার পরেও অবশিষ্ট থেকে যাবে। তিনি (সা.) বললেন, যারা অস্ত্র ত্যাগ করবে, তাদেরকেও কিছু বলা হবে না। আবু সুফিয়ান বললেন, হে রসুলুল্লাহ্! তাহলেও কিছু লোক থেকে যাবে। তিনি (সা.) বললেন, যারা নিজেদের ঘরের দরজা বন্ধ করবে, তাদেরও আশ্রয় দেওয়া হবে। তিনি বললেন, হে রসুলুল্লাহ্! গলিতে যারা বসবাস করে, ওই অসহায় মানুষগুলো মারা যাবে। তিনি (সা.) বললেন, আচ্ছা বেশ, বেলাল (রা.)-এর একটি পতাকা প্রস্তুত কর। আবু রাবিহা (লা.) নামে একজন সাহাবী ছিলেন। তিনি (সা.) যখন মদিনায় মোহাজেরীন ও আনসারদের মাঝে ভ্রাতৃত্ববন্ধন করেছিলেন, তখন আবু রাবিহা (রা.) কে বেলালের ভাই বানিয়েছিলেন। ঐ সময় বেলাল সম্ভবত ছিলেন বা কোন অভিপ্রায় ছিল, যাইহোক তিনি (সা.) বেলাল (রা.)-এর পতাকা তৈরী করলেন এবং আবি রাবিহা (রা.) কে প্রদান করে বললেন, এটা বেলাল (রা.)-এর পতাকা, এটা নিয়ে চৌমাথায় দাঁড়িয়ে ঘোষণা কর- যে ব্যক্তি বেলাল (রা.)-এর পতাকা তলে দাঁড়াবে তাকে পরিত্রান দেওয়া হবে। আবু সুফিয়ান বললেন, এই পর্যন্ত যথেষ্ট হয়েছে, মক্কা রক্ষা পাবে। এখন আমাকে অনুমতি দিন। তিনি (সা.) বললেন, যাও।

মক্কাতে আবু সুফিয়ানের ঘোষণা

এখন তো গোষ্ঠীপ্রধান স্বয়ং অস্ত্র নিক্ষেপ করে দিয়েছে। সংবাদ পৌছান বা না পৌঁছানর কোন প্রশ্নই ছিল না। হতবুদ্ধি হয়ে মক্কায় প্রবেশ করলেন এবং বলতে থাকলেন, হে জনগণ! নিজ নিজ ঘরের দরজা বন্ধ করে দাও। নিজ নিজ অস্ত্র নিক্ষেপ করে দাও। হে জনগণ! কাবা শরীফে গমন কর। বেলাল (রা.)-এর পতাকা দাঁড় করানো আছে।তার নীচে দাঁড়িয়ে যাও। ইতিমধ্যে লোকে দরজা বন্ধ করা আরম্ভ করে দিলেন। কিছুলোক কাবা শরীফের মধ্যে ঢুকতে শুরু করে দিলেন। জনসাধারণ অস্ত্র নিক্ষেপ করা শুরু করে দিলেন। ইত্যবসরে ইসলামী সৈন্যরা শহরে প্রবেশ করল। জনগণ বেলাল (রা.)-এর পতাকাতলে একত্রিত হয়ে গেল।

হযরত বেলাল (রা.)-এর পতাকা খাড়া করানোর বিজ্ঞতা

এই ঘটনার মধ্যে অত্যন্ত চমৎকার ব্যাপার হল বেলাল (রা.)-এর পতাকা। রসুল করীম (সা.) বেলাল (রা.) এর পতাকা তৈরী করে বললেন, যে ব্যক্তি বেলাল (রা.)-এর পতাকা তলে দাঁড়িয়ে যাবে, তাকে আশ্রয় দেওয়া হবে। অথচ 'সর্দার' (নেতা) তো মোহম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সা.) ছিলেন। কিন্তু মোহাম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সা.) এর পতাকা খাড়া করানো হয় নি। তারপর ত্যাগস্বীকারকারী আবু বকর (রা.) ছিলেন। কিন্তু আবু বকর (রা.) এর কোন পতাকা খাড়া করা হয় নি। তারপর মুসলমান হওয়া প্রধান ওমর (রা.) ছিলেন। কিন্তু তারও কোন পতাকা খাড়া করা হয় নি। তারপর জনপ্রিয় ওসমান (রা.) ছিলেন। তিনি মহম্মদ (সা.)-এর জামাতা ছিলেন। কিন্তু ওসমানের কোন পতাকা খাড়া করা হয় নি। এরপর আলী (রা.) ছিলেন, যিনি রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর ভাই ও জামাতা ছিলেন। কিন্তু আলী (রা.)-এর কোন পতাকা খাড়া করা হয় নি। তারপর আব্দুর রহমান বিন অউফ (রা.) এমন ব্যক্তি ছিলেন যার সম্বন্ধে রসুল করীম (সা.) বলেছেন, তিনি ঐ ব্যক্তি যিনি যতদিন বেঁচে থাকবেন, মুসলমান জাতির মধ্যে বিভেদ থাকবে না। কিন্তু আব্দুর রহমান বিন অউফ (রা.) এর কোন পতাকা খাড়া করা হয় নি। তারপর আব্বাস (রা.) তাঁর চাচা ছিলেন এবং কখনও উদ্ধত আচরণও করতেন তবু তিনি (সা.) রাগান্বিত হতেন না। কিন্তু রসুলুল্লাহ্ (সা.) তারও কোন পতাকা তৈরী করেন নি। তারপর সমস্ত প্রধান প্রধান ব্যক্তিরা ও শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন, খালেদ বিন ওলীদ (রা.) যিনি এক প্রধানে পুত্র ও স্বয়ং প্রসিদ্ধ লোক উপস্থিত ছিলেন। আমর বিন আস (রা.) একজন প্রধানের পুত্র ছিলেন এবং বড় বড় সর্দারের পুত্রগণ ছিলেন। কিন্তু তাদের মধ্যে কারো একজনের পতাকা তৈরী করা হয় নি। কেন বেলাল (রা.)-এর পতাকা তৈরী করা হল? এর কারণ কি ছিল? এটার কারণ এই ছিল, কাবা শরীফের দিকে যখন আক্রমণ উদ্যত হয়েছিলেন, আবু বকর (রা.) দেখেছিলেন, যারা মারা যাবে তারা তো তার আত্মীয়-স্বজন। তিনি নিজেও বলে দিয়েছিলেন, হে রসুলুল্লাহ্ (সা.)! আমার ভাইদেরও মারবেন?তিনি অত্যাচারকে ভুলে দিয়েছিলেন যে এরা আমার ভাই। ওমর (রা.) তো বলেছিলেন, এইসব কাফেরদের মারুন। কিন্তু তিনি (সা.) যখন ক্ষমা করতে এলেন, তখন তিনি মনে মনে বলে থাকবেন, ভালই হল, ভাইদের ক্ষমা করা হল। ওসমান (রা.) ও আলী (রা.) বলে থাকবেন, আমাদের ভাইদের ক্ষমা করা হল। যদিও তারা আমাদের কষ্ট দিয়েছে, তাতে কি? স্বয়ং রসুল করীম (সা.) তাদের ক্ষমা করার সময় এটা বুঝলেন, তাদের মধ্যে আমার চাচা ও ভাইও ছিল আর জামাতা, প্রিয়জন ও আত্মীয়-স্বজনও ছিল। আমি তাদের ক্ষমা করে দিয়েছি তো ভালই হয়েছে। আমার নিজের আত্মীয়রা রক্ষা পেল। কেবল এক ব্যক্তি ছিল, মক্কায় যার কোন আত্মীয় স্বজন ছিল না, শক্তি ছিল না, সাথী সঙ্গী ছিল না। অসহায় অবস্থায় তার উপর অত্যাচার করা হত, যা না আবু বকর, আলী, ওসমান ও ওমর (রা.)-এর উপর হয়েছে। পক্ষান্তরে রসুল করীম

(শেষাংশ শেষ পৃষ্ঠায়.....)

যুগ ইমামের বাণী

প্রত্যেক প্রভাত যেন সাক্ষ্য দেয় যে তুমি রাত্রিকাল তাকওয়ার সাথে কাটিয়েছ এবং প্রত্যেক সন্ধ্যা যেন সাক্ষ্য দেয় যে তুমি ভীতির সাথে দিবস যাপন করেছো। (আমাদের শিক্ষা, পৃ: ৬, বাংলা)

দোয়াপ্রার্থী: Late Sawkat Ahmad Molla & Jahanara Bibi
From-Sabina Parveen. Banshra, 24 PGS (s)

(১ম পাতার পর.....)

(সা.)এর প্রাণের শত্রুতে পরিণত হল, সেই সময়কার এইরূপ একটি ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যে, আবু জাহলের কাছ থেকে এক ব্যক্তির কিছু অর্থ পাওনা ছিল, কিন্তু আবু জাহল সেই অর্থ দিতে অস্বীকার করছিল। সেই ব্যক্তি রসুল করীম (সা.)–এর নিকট এসে নিবেদন করে, আপনি 'হিলফুল ফিজুল'–এর সদস্য ছিলেন এবং আপনি শপথ করেছিলেন যে, সর্বদা অত্যাচারিতদের সাহায্য করবেন। আপনাকে আপনার সেই শপথের দোহাই দিয়ে আবেদন করছি, আবু জাহলের কাছে আমার কিছু অর্থ পাওনা আছে, আপনি তার কাছে গিয়ে সেই টাকা আদায় করে দিন। সেই সময় মক্কায় প্রকাশ্যে চলাফেরা করা আঁ হযরত (সা.)–এর জন্য বিপজ্জনক ছিল আর আবু জাহল আঁ হযরত (সা.)–এর সব চেয়ে বড় শত্রু ছিল আর সে তাঁর কোন ক্ষতিও করতে পারত। কিন্তু তা সত্ত্বেও সেই ব্যক্তির কথা শোনামাত্র আঁ হযরত (সা.) তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়ালেন এবং তাকে সঙ্গে নিয়ে আবু জাহলের বাড়িতে পোঁছলেন এবং দরজার কড়া নাড়লেন। আুব জাহল দরজার কড়া নাড়ার শব্দ শুনে বাইরে এল। আঁ হযরত (সা.) তাকে বললেন, এই ব্যক্তির কিছু টাকা তোমার কাছে পাওনা আছে, অবিলম্বে তাকে ফেরত দাও। আবু জাহল কোন উচ্চবাচ্য না করেই ভিতরে গেল এবং টাকা নিয়ে সেই ব্যক্তির হাতে দিল। আবু জাহল মহম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সা.)–এর নির্দেশে এক ব্যক্তিকে তার পাওনা টাকা ফেরত দেওয়ার ঘটনাটি চেপে রাখা সম্ভব ছিল না। ঘটনার সংবাদ দাবানলের ন্যায় মক্কায় ছড়িয়ে পড়ল আর লোকের মধ্যে বলাবলি শুরু হল যে, আবুল হাকাম আমাদেরকে বলে মহম্মদ (সা.)এর কথা শুনবে না, কিন্তু সে নিজে এতটা ভয় পেয়ে গেল যে, এক মিনিটের মধ্যে টাকা ফেরত দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেল। এই সব কথা যখন তার কানে গেল,তখন সে বলল, খোদার কসম! তোমরা যদি আমার স্থানে থাকতে, তবে তোমরাও সেই একই কাজ করতে যা আমি করেছি। কেননা যখন মহম্মদ (সা.) এলেন, তখন আমি তার ডান ও বাম পাশে দেখতে পাই দুটি উন্মত্ত উট দাঁড়িয়ে আছে, যা দেখে আমি আমি ভীষণ ভয় পেয়ে যাই। আর আমার মনে হল, আমি যদি তার কথা না শুনি তবে উট দুটি আমাকে চিরে ফেলবে। এখন একথা আল্লাহই ভাল জানেন যে, সে এমন কোন দৃশ্য দেখেছিল কি না কিম্বা সত্যের প্রভাব তার মনে ভীতির সৃষ্টি করেছিল। তবে যাইহোক রসুল করীম (সা.) 'হিলফুল ফুযুল'–এর অঙ্গীকারের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ থেকে একজন অত্যাচারিত ব্যক্তির অধিকার আদায়ের জন্য চরম বিপদের আশঙ্কাকে তুচ্ছ করে আবু জাহলের কাছে যখন গিয়েছেন, তখন সত্যের প্রতাপ তার মধ্যেকার অনিষ্ট সাধনের স্পৃহাকে পিষে মেরেছে, যার কারণে সে অত্যাচারিতের অধিকার দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেছে।

এছাড়াও রসুল করীম (সা.) অঙ্গীকারের প্রতি বিশ্বস্ততা রক্ষার বিষয়ে ভীষণ যত্নবান ছিলেন,এতটাই যে, হুদায়বিয়া সন্ধির সময় যখন এই মর্মে চুক্তি হয় যে, মক্কাবাসীদের মধ্য থেকে যদি কোন যুবক মুসলমান হয় তবে তাকে তার আত্মীয়দের কাছে ফেরত পাঠাতে হবে। কিন্তু যে মুসলমান মক্কাবাসীদের কাছে ফিরে যাবে তাকে মক্কাবাসী মুসলমানদের কাছে ফেরত দিতে বাধ্য থাকবে না; চুক্তি লেখার পর এর কালি তখনও শুকায় নি, এরই মাঝে সুহায়েল- যে মক্কাবাসীদের পক্ষ থেকে সন্ধি করছিল, তার ছেলে দড়িতে বাঁধা ক্ষত-বিক্ষত অবস্থায় রসুল করীম (সা.)–এর সামনে এসে পড়ল এবং বলল- হে আল্লাহর রসুল! আমি অন্তর থেকে মুসলমান, কিন্তু আমার পিতা ইসলামের কারণে আমাকে কষ্ট দিচ্ছেন। আজ আমার পিতা এখানে এসেছেন। আমি সুযোগ পেয়ে এখানে পালিয়ে এসেছি। রসুল করীম (সা.) কোন উত্তর দেওয়ার পূর্বেই তার পিতা বলে উঠল, সন্ধি হয়ে গেছে। এখন তাকে আমার সাথে যেতে হবে। আবু জিন্দল–এর অবস্থা সেই মুহূর্তে এতটাই বেদনাদায়ক ছিল যে, মুসলমানদের চোখ দিয়ে অঝোরে অশ্রু ধারা বইতে শুরু করে। আবু জিন্দল নিজেও রসুলুল্লাহ্ (সা.)–এর নিকট নিবেদন করে যে, হে রসুলুল্লাহ্! আপনি কি আমাকে মক্কাবাসীদের হাতে পূর্বের চায়তে আরও বেশি নির্যাতিত হতে তাদের কাছে ফেরত পাঠিয়ে দিবেন? কিন্তু আঁ হযরত (সা.) বললেন, খোদার রসুল চুক্তি ভঙ্গ করে না। তোমাকে অবশ্যই ফেরত যেতে হবে। তুমি ধৈর্য ধারণ কর এবং খোদার উপর আস্থা রাখ। অতঃপর তাকে মক্কায় পাঠিয়ে দেওয়া হল। এরপর আঁ হযরত (সা.) যখন মদিনায় পোঁছলেন, তখন আবু বাসীর নামে মক্কার আরও এক যুবক আঁ হযরত (সা.)–এর পিছন পিছন মদিনায় এসে পোঁছয়। কিন্তু রসুলুল্লাহ্ (সা.) তাকেও চুক্তি অনুসারে মক্কা ফিরে যেতে বাধ্য করেন। অনুরূপভাবে রসুল করীম (সা.) অঙ্গীকারের প্রতি বিশ্বস্ততা রক্ষার বিষয়ে এতটাই যত্নবান ছিলেন যে, একবার এক রাষ্ট্রদূত রসুল করীম (সা.)–এর নিকট কোন বার্তা নিয়ে আসে আর আঁ হযরত (সা.)–এর সাহচর্যে কিছু দিন থাকার পর সে ইসলামের সত্যতার অনুরাগী হয়ে ওঠে। সে রসুল করীম (সা.)–এর নিকট নিবেদন করে যে, হে রসুলুল্লাহ্ (সা.) আমি নিজেকে মুসলমান হিসেবে পরিচয় দিতে চাই। রসুল করীম (সা.) বললেন, এটা সমীচীন হবে না। তুমি নিজ রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে এক বিশিষ্ট পদাধিকারী হিসেবে নিযুক্ত আছ। তুমি এই অবস্থাতেই ফিরে যাও। ফিরে যাওয়ার পরও যদি তোমার হৃদয়ে ইসলামের প্রতি ভালবাসা অটুট থাকে তবে পুনরায় এখানে এসে ইসলাম গ্রহণ করো।

মুসলমানরাও নিজেদের অঙ্গীকারের প্রতি বিশ্বস্ত থাকতেন। একবার কাফেররা যুদ্ধের সময় প্রতারণা করে একজন কৃষ্ণাঙ্গ মুসলমানের সঙ্গে চুক্তি করে নেয় আর সে দুর্গের ফাটক খুলে দেয়। সৈন্যবাহিনী যখন দুর্গের মধ্যে প্রবেশের জন্য অগ্রসর হল, তখন তারা বলল- তোমাদের সঙ্গে তো আমাদের চুক্তি হয়ে গেছে। সেনাপতি বলল, আমার সঙ্গে কোন চুক্তি হয় নি। তারা বলল, আমরা একজন হাবশির সঙ্গে চুক্তি করেছিলাম। সে কিছু শর্তসহকারে আমাদেরকে নিরাপত্তা দিয়েছিল। সেনাপতি বলল, সে চুক্তি করার এক্তিয়ার রাখে না, চুক্তি আমার সঙ্গে হওয়া উচিত ছিল। তারা বলল, আমরা সেসব জানি না, তোমাদের সঙ্গে আমরা চুক্তি সেরে ফেলেছি। যখন এই বিবাদ ঘনীভূত হল, তখন ইসলামী সেনাবাহিনীর সেনাপতি হযরত উমর (রা.)কে ঘটনার বৃত্তান্ত লিখে পাঠালেন এবং এই মুহূর্তে কি করণীয় তা জানতে চাইলেন। হযরত উমর (রা.) উত্তরে লিখলেন- 'আল্লাহ্ তা'লা অঙ্গীকারের প্রতি বিশ্বস্ততা রক্ষাকে অনেক বেশি গুরুত্ব দান করেছেন। অতএব, তোমরা এই চুক্তি পালন কর আর ততদিন এর উপর প্রতিষ্ঠিত থাক যতদিন অপর পক্ষ নিজে থেকে চুক্তির বিরুদ্ধাচরণ না করে।

মোটকথা ইসলাম সততা, বিশ্বস্ততা এবং অঙ্গীকার রক্ষাকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে থাকে। ইসলাম মতে, সেই মোমেনই সফলকাম হতে পারে, যে- বিশ্বস্ততা এবং অঙ্গীকার রক্ষার সর্বোৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারে।

(তফসীরে কবীর, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ১৩৩–১৩৪)

অঙ্গ সংগঠনগুলির বাৎসরিক ইজতেমা(২০২৫)

আগামী ২৪,২৫ ও ২৬ শে অক্টোবর, ২০২৫ সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.)–এর অনুমোদন ক্রমে এবছর মজলিস খুদ্দামুল আহমদীয়া ভারত, মজলিস আনসারুল্লাহ্ ভারত এবং লাজনা ইমাইল্লাহ্ ভারত–এর বাৎসরিক ইজতেমা কাদিয়ান দারুল আমান–এর অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। জামাতের সদস্যদের সেই অনুসারে দোয়ার মাধ্যমে এই সকল ইজতেমায় অংশগ্রহণের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করুন। (সদর মজলিস খুদ্দামুল আহমদীয়া ভারত)

অনলাইন কোরআন সপ্তাহ কর্মসূচির রিপোর্ট
৬-১২ ই জুলাই, ২০২৫
কান্দি জোন, মুর্শিদাবাদ

৬–১২ই জুলাই, ২০২৫ সপ্তাহব্যাপী কুরআন কর্মসূচি 'হাফতা কুরআন' সফলভাবে সম্পন্ন হল। এই কর্মসূচিতে প্রতিদিন বিভিন্ন সম্মানিত সভাপতি ও ক্বারী, বক্তা এবং সাধারণ সদস্যদের নিয়ে অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে কুরআনের শিক্ষা ও ইসলামিক নীতির বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়। সন্ধ্যাবেলায় মূলত ৬:৫০টা থেকে ৭:৫০ পর্যন্ত অধিবেশনগুলিতে অনুষ্ঠিত হয়েছিল, যার মধ্যে একটি অধিবেশন সন্ধ্যা ৭:১০টায় শুরু হয়েছিল শুক্রবারের জন্য।

সংবাদদাতা: আব্দুর রউফ
সঞ্চালক (হফতা কুরআন),কান্দি জোন, মুর্শিদাবাদ,

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2023 -2025 Vol-10 Thursday, 14 Aug 2025 Issue No.33

MANAGER
SHAIKH MUJAHID AHMAD
Mob: +91 9915379255
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs. 600/- (Per Issue : Rs. 12/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

(সা.)-এর উপরও হয় নি। বেলাল (রা.) কে জ্বলন্ত ও উত্তপ্ত বালির উপর উলঙ্গ করে শায়িত করা হত। তোমরা দেখ, সেও জুন মাসে খালি পায়ে হাঁটা যায় না। তাকে উলঙ্গ করে উত্তপ্ত বালির উপর শায়িত করে দেওয়া হত। আবার পেরেক লাগানো জুতো পরে যুবকরা তার বুকের উপর নাচানাচি করে বলত, বল খোদা ছাড়া আরও উপাস্য আছে। বল, মোহম্মদ (সা.) মিথ্যাবাদী। যখন বেলাল (রা.) নিজ মুখ থেকে হাবশি উপভাষায় বলতেন, আসহাদো আল্লাইলাহা ইল্লাল্লাহ, তখন তাকে অত্যন্ত মারধর করা হত। ঐ ব্যক্তি উত্তর দিত, তোমরা আমাকে যতই অত্যাচার কর, যখন আমি দেখেছি খোদা এক তো দুই কি করে বলব। আর যখন আমি জানি মোহাম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সা.) খোদার সত্য রসুল, তবে তাকে আমি মিথ্যা কি করে বলব। অধিকন্তু তাকে আরও মারা আরম্ভ করে দিত। মাসের পর মাস গরমকালে তার একই দশা হত। এইরূপে শীতকালে তার পায়ে দড়ি বেঁধে তাকে মক্কায় পাথরের গলিতে টেনে-হেঁচড়ে নিয়ে যেত। তার ত্বকে ক্ষত হয়ে যেত। তারা টেনে-হেঁচড়ে নিয়ে গিয়ে বলত, বল মহম্মদ (সা.) মিথ্যাবাধী, বল খোদা ব্যতীত আরও উপাস্য আছে। তখন তিনি বলতেন, আসহাদো আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্। এক্ষণে যখন ইসলামী সৈন্যরা দশ হাজার সংখ্যায় প্রবেশ করতে এল, বেলাল (রা.) এর অন্তরে মনে হল, আজ বুটের বদল নেওয়া ক্ষতিপূরণ আমি পেয়ে যাব। যখন রসুল করীম (সা.) বললেন, যারা আবু সুফিয়ানের গৃহে ঢুকে পড়বে তাদের মাফ করা হবে।যারা কাবা শরীফে প্রবেশ করবে, তাদের মাফ করা হবে, যারা অস্ত্র বর্জন করবে তাদের মাফ করা হবে। যারা নিজেদের ঘরের দরজা বন্ধ করে দিবে তাদের মাফ করা হবে। তখন বেলাল (রা.) এর অন্তরে মনে হবে, এরা তো নিজের ভাইদের মাফ করছেন ভালই করছেন, কিন্তু আমার বদলা তো অবশিষ্ট থেকে গেল। রসুল করীম (সা.) দেখলেন, আজ কেবল এক ব্যক্তি আছে, আমার মাফ করা মাফ করায় তার কষ্ট হতে পারে। সে হচ্ছে বেলাল (রা.) যাদের মাফ করছি তারা তার ভাই নয়। তাকে যে কষ্ট দেওয়া হয়েছে, আর কাউকেও দেওয়া হয় নি। তিনি (সা.) বললেন, আমি এর প্রতিশোধ নিব আর এমনভাবে নিব, যা আমার নবুয়তের মর্যাদা অক্ষুন্ন থাকে এবং বেলাল (রা.) এর অন্তর আনন্দিত হয়। তিনি (সা.) বললেন, বেলাল (রা.)-এর পতাকা খাড়া কর। মক্কার ঐ সমস্ত সর্দারগণ যারা জুতা পরে নাচানাচি করত, যারা তার পায়ে দড়ি বেঁধে টেনে-হেঁচড়ে নিয়ে যেত, উত্তপ্ত বালির উপর শুইয়ে দিত। তাদেরকে বলে দাও, যদি নিজের ও স্ত্রী-বাচ্চাদের প্রাণ রক্ষা করতে চাও তাহলে বেলাল (রা.) এর পতাকাতলে এসো। আমি মনে করি, যখন থেকে পৃথিবী সৃষ্টি হয়েছে, মনুষ্যজাতি শক্তি অর্জন করেছে, একজন মানুষ অপর একজন মানুষকে খুন করতে উদ্যত হয়েছে, শক্তি অর্জন করার পরও এই প্রকার মহান প্রতিশোধ আজ পর্যন্ত কোন মানুষ নেয় নি। বেলাল (রা.) -এর পতাকা কাবা শরীফের উন্মুক্ত মাঠে পুঁতে দেওয়া হল। ইতিপূর্বে যখন আরবের প্রধানরা তাকে পা দিয়ে মাড়িয়ে দিয়ে বলত, বলো 'মোহম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সা.) মিথ্যাবাদী। যখন তারা ছুটতে ছুটতে স্ত্রী ও বাচ্চাদের নিয়ে বেলাল (রা.)-এর পতাকা তলে নিয়ে এসেছিল, যাতে তাদের প্রাণ রক্ষা পায়। তখন তার আত্মা ও প্রাণ মোহাম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর উপর কেমন করে উৎসর্গিত হয়েছিল। তিনি হয়তো বলে থাকবেন, আমার কাছে কোন সংবাদ নেই, কাফেরদের সঙ্গে প্রতিশোধ নেওয়ার ছিল বা ছিল না। কিংবা নেওয়া যেত পারত কি না। এখন ঐ প্রতিশোধ নেওয়া হয়েছে। প্রত্যেক ব্যক্তি যাদের জুতো আমার বুকের উপর উঠেছিল তাদের মাথা আমার জুতার উপর ঝুঁকিয়ে দিয়েছে।

সপাপ্ত

যুগ ইমামের বাণী

খোদা আমাকে সম্বোধন করে বলেছেন, "তোমার উপর আশিসের পর আশিস বর্ষণ করতে থাকব। এমনকি সম্রাটগণ পর্যন্ত তোমার বস্ত্র হতে কল্যাণ খুঁজবে।" (তাজাল্লিয়াতি ইলাহিয়া, পৃ: ১৬)

দোয়াপ্রার্থী: **Abdus Salam Master, Nararvita (Assam)**

(খুতবার শেষাংশ...)

দ্বিতীয় জানাযা হলো মুকাররমা নাযমুন বিবি যুবায়ের সাহেবার। তিনি জার্মানির মুহাম্মদ শাফি যুবায়ের সাহেবের স্ত্রী ছিলেন। সম্প্রতি তিনি ইন্তেকাল করেছেন, اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ ۔ । তিনি মূলত মরিশাসের মানুষ ছিলেন। তার পরিবারে আহমদীয়াতের সূচনা তার দাদা মোহাম্মদ হানীফ সিধু সাহেবের মাধ্যমে হয়েছে। তার শোকসন্তপ্ত পরিবারে এক পুত্রও এক কন্যা রয়েছেন। ছেলে আতহার যুবায়ের সাহেব হচ্ছেন হিউম্যানিটি ফার্স্ট জার্মানির চেয়ারম্যান।আতহার যুবায়ের সাহেব লিখেছেন, তিনি অটল ঈমান ও পরম বিনয়ের প্রকৃষ্ট উদাহরণ ছিলেন। আমি দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে বলতে পারি, যেভাবে তিনি আমার লালনপালন করেছেন এবং যে-সব কথা আমাকে শিখিয়েছেন, তিনি অত্যন্ত দৃঢ় ঈমানের অধিকারিণী ছিলেন। কখনও তাকে কোনো অভাব-অনুযোগ করতে শুনি নি। যখন তিনি কঠিন অসুস্থতায় ভুগছিলেন, তখন বিশেষভাবে তার পাশে থাকার সুযোগ হয়েছিল। যখনই তিনি হুঁশ ফিরে পেতেন তখনই নামাযের বিষয়ে জিজ্ঞেস করতেন। নামাযের ব্যাপারে তিনি ছিলেন নিয়মিত ও যত্নবান। তিনি ছিলেন অতুলনীয় ধৈর্য ও সহ্য ক্ষমতার অধিকারিণী। সবসময় আল্লাহ্ তা'লার সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট থাকতেন। তিনি (আতহার সাহেব) একটি ঘটনাও লেখেন, তিনি মানুষের অনেক উপকার করতেন এবং খুবই গোপনীয়তা রক্ষা করতেন। একবার কোনো এক দম্পতির কিছু পারিবারিক সমস্যা ছিল। তিনি আমাকে বলেন, তুমি স্বামীটিকে জিজ্ঞেস করো, কী নিয়ে সমস্যা? আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, তার স্ত্রী কী বলেছে- সেটা আমাকে বলুন। তিনি বলেন, সে আমাকে বিশ্বাস করে কথা বলেছে; আমি তোমাকে তা বলতে পারব না। যদি সে নিজে থেকে বলতে চায় তাহলে বলবে। তবে তুমি চেষ্টা করো যেন তাদের মধ্যে মিটমাট হয়ে যায়। খিলাফতের সাথে তার গভীর সম্পর্ক ছিল এবং তিনি খুব মনোযোগ দিয়ে খুতবা শুনতেন। তার নাতি লিখেছে, তিনি দুই-তিনবার খুতবা শুনতেন এবং বলতেন, প্রথমবারে পুরোপুরি বোঝা যায় না; আর যদি মনোযোগ দিয়ে না শোনা হয়, তাহলে কোনো উপকার নেই। আল্লাহ্ তা'লার সাথে তার গভীর সম্পর্ক ছিল। তিনি রুইয়া (সত্যস্বপ্ন) দেখতেন। তার অনেক স্বপ্ন সত্য প্রমাণিত হয়েছে। যুবায়ের সাহেব লেখেন, এই শেষ অসুস্থতার দিনগুলোতে তিনি বলেছিলেন, আমার ক্যান্সার হয় নি তো? তখন সিটি স্ক্যান করা হলে জানা যায়, সত্যিই তার মূত্রাশয়ে ক্যান্সার হয়েছে। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করেন, আপনি কীভাবে জানলেন? তিনি তখন বলেন, আল্লাহ্ তা'লা আমাকে জানিয়েছেন। স্বপ্নে তার এক প্রয়াত আত্মীয়া তার কাছে আসেন এবং বলেন, তোমার ছেলে হয়ত তোমাকে জানাবে না, পাছে তুমি দুশ্চিন্তায় পড়ো; কিন্তু আমি তোমাকে জানাচ্ছি, তোমার ক্যান্সার হয়েছে। এইভাবে আল্লাহ্ তা'লা তাকে আগেই তার রোগ সম্পর্কে জানিয়ে দিয়েছিলেন।তার পুত্রবধূ জার্মান; তিনি তাদের সাথেও এমন গভীর সম্পর্ক গড়ে তুলেছিলেন এবং তরবিয়ত করেছিলেন যে, তারা জার্মান হওয়া সত্ত্বেও সব বিষয়ে তার সাথে পরামর্শ করতেন এবং তার জন্য সব ধরনের ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত। তার এক পুত্রবধূ সুজান জুবায়ের বলেন, শাশুড়ি হিসেবে তিনি ছিলেন স্নেহ ও দয়ার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। যা কিছু তার কাছে থাকতো তাতেই সন্তুষ্ট থাকতেন। পুত্রবধূদের সাথে নিজের মেয়েদের মতোই ব্যবহার করতেন। আমাদের ভুলত্রুটি খুব আদরের সঙ্গে সংশোধন করতেন এবং সবসময় আমাদের জন্য দোয়া করতেন।দ্বিতীয় পুত্রবধূ মারিয়া যু বায়ের বলেন, বিয়ের পর তিনি আমাকে রান্না করা এবং অতিথিদের আপ্যায়নের পদ্ধতি শেখান এবং এই কাজগুলো কোনো চাপ প্রয়োগ করা বা তির্যক কথা বলা ছাড়াই শিখিয়েছেন। আমার পড়ালেখার সময়ও তিনি আমাকে অনেক সাহায্য করেন। পরবর্তীতে তিনি অর্থাৎ এই পুত্রবধু মেডিসিন নিয়ে পড়াশোনা করেন। তিনি বলেন, জামা'তের কার্যক্রমেও তিনি আমাকে পরিপূর্ণ সহযোগিতা করেন। আমার সন্তানদের দেখাশোনাও করতেন এবং সবসময় আমাকে সাহস ও উৎসাহ দিতেন। আল্লাহ্ তা'লা তার প্রতি দয়া ও কৃপার আচরণ করুন এবং তার সন্তানদেরকে তার দোয়ার উত্তরাধিকারী করুন। (আমীন)

(আল ফজল ইন্টারন্যাশন্যাল, ২০ শে জুন, ২০২৫)

****

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir